তৃতীয় অধ্যায়

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ : অন্নদাশঙ্করের মননভূমি

সুন্দর ও সামগ্রিক জীবন চেতনাই যদি সংস্কৃতি হয়, তবে চলনে-বলনে, মননে-মেজাজে, কথায়-কাজে, ভাবে-ভাবনায়, আচারে-আচরণে সুন্দরের অনুশীলন ও অভিব্যক্তিও তাহলে সংস্কৃতিমনস্কতা। আর সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি অসুন্দর, অকল্যাণ এবং অপ্রেমের অরি। কারণ সংস্কৃতি আমাদের মার্জিত করে, সংস্কার করে, পরিশীলিত করে। সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়, নিয়ে যায় গভীরতায় ও ব্যাপ্তির দিকে। এর জন্য অবশ্য প্রয়োজন সুকর্ষিত মনোভূমি ও পরিশ্রুত চেতনা। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সংস্কৃতি চিন্তা এর বাইরে নয়। প্রাবন্ধিকের সংস্কৃতি চিন্তায় একাধিক ধারার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে ভারতের সংস্কৃতি গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও লোকসংস্কৃতির সমন্বিত রূপ। সংস্কৃতির এই চতুরঙ্গের পাশে সত্য ও অহিংসার সাথে সৌন্দর্যকে যোগ করে, সৌন্দর্যকেই সংস্কৃতির মধ্যমণি করেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন 'মডার্ন' ও 'মরাল' সংস্কৃতির। কিন্তু এর বিকাশের জন্য প্রয়োজন দেশের মাটি, দেশের ভাষা, দেশীয় ঐতিহ্য। কেননা মা জন্ম দেয়, মাটি লালন করে। কিন্তু এক সময় মায়ের প্রয়োজন ফুরালেও মাটির প্রয়োজন মৃত্যুর পরেও থেকে যায়। আবার তাঁর আক্ষেপের সুরেও মেলে অন্য মেজাজ। তিনি বলেন আমাদের সংস্কৃতির পায়ের তলায় রিয়ালিটি নেই। এর জন্য অবশ্য প্রকৃতির সাথে মোকাবিলা করার কথা বলেছেন। কেননা তিনি সংস্কৃতির মিলনে বিশ্বাসী, বিরোধের হেতুতে নয়। তাঁর সংস্কৃতি চিন্তায় ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি দিক বেশ স্বতন্ত্র বুননে অনন্য।

'সংস্কৃতি' শব্দটির 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে শিল্পের কাজ কী সে সম্পর্কে আলোকপাত রয়েছে মাত্র। 'সংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজি Culture এর প্রতিশব্দ। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে সত্য বলে ধরার কথা বলেছেন। ১) মনের স্বাধীনতা, ২) বিশ্বমানবতা ও ৩) শালীনতা। রবীন্দ্রনাথের মতে, সংস্কৃতি হল মনের কৃষ্টি। মনোভূমি চাষ করাই সংস্কৃতি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সংস্কৃতি-শিল্প-ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন যে, 'কালচার', সংস্কৃতি' ও 'কৃষ্টি' মোটামুটি সমার্থক হলেও 'সংস্কৃতি' শব্দের যে ব্যাপকতা 'কৃষ্টি' শব্দের মধ্যে তা নেই। রবীন্দ্রনাথও 'কৃষ্টি' শব্দটিকে গ্রহণ করতে চাননি। ইংরেজি 'কালচার' (Culture) শব্দের উৎস হল লাতিন 'কুলতুরা' (Cultura)। এটি কোল্ (Col) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। Co অর্থাৎ 'কৃষ' অর্থে চাষ করা বোঝায়। অনেক সময় সংস্কৃতি বলতে সাধারণত কৃষ্টিকেই বোঝায়, সংস্কারের কথা আসে না। কিন্তু 'সংস্কৃতি' বলতে মার্জিত, সংস্কার ও মনোভূমি কর্ষণের কথাই বেশ

যুক্তি যুক্ত।

অন্নদাশঙ্কর রায় যেহেতু চলতি হাওয়ার পন্থী সেহেতু 'কালচার' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটিই মেনে নিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের মতে সংস্কৃত আর সংস্কৃতি একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলেও একটু আলাদা। মোট কথা কৃষির সঙ্গেই কৃষ্টি তথা সংস্কৃতির নিকট সম্পর্ক। যে ফসল ফলেনি তাকে ফলানোই কৃষকের কর্ম। তার জন্য চাষ করতে হয়। তবে সবাই যদি রিফাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকে কাল্টিভেট করবে কে? নতুন ফসল ফলবে কী করে? তিনি আরো জানান, পুরনো বোতলে নতুন মদ থেকেই আমাদের রেনেসাঁস। পরে অবশ্য এর বিপরীত দৃশ্য-নতুন বোতলে পুরনো মদ। তাঁর মতে ''দেশকে স্বাধীন করাই যথেষ্ট নয় দেশের মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, সৃষ্টি করতে, নির্মাণ করতে শেখাতে হবে। পশ্চিমের সঙ্গে, আধুনিকের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে। পশ্চাতের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে হবে। জনগণের সঙ্গে, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। সার্থক সংস্কৃতির এই তিনটি ডাইমেনসন।''[১] কেননা, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি একধর্মী নয়, বহুধর্মী। এখানে বহু ধারা এসে এক দেহে লীন হয়ে গেছে। তবে প্রাবন্ধিকের সংস্কৃতি ভাবনার ত্রিবেনীসঙ্গমের যে ত্রিধারা তাতে গঙ্গা হলো প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, যমুনা মধ্যযুগের ইসলামী সংস্কৃতির প্রতীক আর সরস্বতী ইংরেজ আমলের পাশ্চাত্য তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির প্রতীক। যারা এই ত্রিবেণীর সমাহারে অস্বীকার করে তাদের সতর্ক করে দিয়ে প্রাবন্ধিক বলেন— ''যে সংস্কৃতি নানা বিবাদী সুরকে সংগতি দিতে জানে না সে তার শুদ্ধতা নিয়ে কালগর্ভে বিলীন হয়।''[২]

অর্থাৎ প্রাবন্ধিক বৈচিত্র্যকে অশুদ্ধ বলে বর্জন করেননি। মোট কথা সংস্কৃতির মধ্যে কেবল একটি নয়, একাধিক ধারায় স্বর-সংগতি রয়েছে। কী ভাষা, কী সাহিত্য, কী সঙ্গীত, কী চিত্রকলা, কী ভাস্কর্য, কী স্থাপত্য, কী বেশভূষা, কী রন্ধনকলা, কী দর্শন, কী বিজ্ঞান, কী সমাজতত্ত্ব-যে দিক থেকেই বিবেচনা করা হোক ভারতীয় সংস্কৃতি ত্রিবেণীর জল। তাঁর মতে— ''ইংরেজী পড়ব না, উর্দু শিখব না। দেড়শ বছরকে অবহেলা করব, হাজার বছরকে অবজ্ঞা করব, এতে আমাদেরই ক্ষতি।''[৩] অর্থাৎ তিনি ভাঙন নয়, পলিমাটির উপর নতুন ফসল ফলবার পক্ষপাতী বলেই হয়তো এই ত্রিবেণীর সাথে লোকসংস্কৃতিকে যুক্ত করেছেন। একটি বিষয় অবশ্য ভাবা দরকার-লোকসংস্কৃতির ইতিহাস কেউ জানে না, কিন্তু সকলের ইতিহাস এর মধ্যেই রক্ষিত। তাই সকল পাঠককে সাবধান করে প্রাবন্ধিক বলে দেন - ভবিষ্যতে যদি কেউ সংস্কৃতির গর্ব করে, তবে এই চারটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তবেই সংস্কৃতির চতুরঙ্গের সার্থকতা।

প্রাবন্ধিক জানেন দেশকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতির বিকাশ সীমাবদ্ধ। যদি তা হতোই তাহলে

ইরান থেকে কলম আমদানি করার সাথে মাটি জল হাওয়া আমদানি করা দরকার, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আসলে তিনি চান বাইরে থেকে গ্রহণ ও পরে সাঙ্গীকরণ। আর এর থেকে বোঝা যায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চির প্রবহমানতার চিত্র।

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, শ্রেণী স্বার্থবাদ, ধর্মান্ধতা যে সংস্কৃতির সর্বনাশ করছে, সেটা কালসচেতন প্রাবন্ধিক বুঝতে পারছেন বলেই প্রকৃতির সাথে সংস্কৃতির রিয়ালিটির মোকাবিলা করার স্বপ্নে সক্রিয়। তিনি আক্ষেপের সুরে জানান— অতিরিক্ত শিল্পায়ণ ও নগরায়ণের পাশাপাশি পথে ঘাটে কিছু সুলভ সিনেমা সংস্কৃতিকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতির ভাঙন ধরেছে। তাই স্বপ্ন দেখেছেন মরাল ও মডার্ন সংস্কৃতির। যা এক হাতে পশ্চাৎপদদের অন্ধতা দূর করবে, অন্য হাতে শক্তিমত্তদের চিত্ত শুদ্ধি ঘটাবে। আর তাই প্রাবন্ধিকের সুরে মিলে স্বর্ণ যুগের সংস্কৃতির কথা—

''আমাদের ভাবী সংস্কৃতি যদি আধুনিকতা ও চিরন্তনতার যুগল অক্ষে আবর্তিত হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ স্বল্পায়ু হবে না, তার থেকে অনর্থ আসবে না, সে হবে আর একটা স্বর্ণযুগের সংস্কৃতি।''[৪] যার মধ্যমণি হবে সত্য ও অহিংসার পাশে সৌন্দর্য। না হলে সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন শিল্প না হয়ে হবে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস। প্রাবন্ধিক সংস্কৃতির রূপসাগরে ডুব দিয়ে সংস্কৃতির ছোট ছোট নুড়ির সন্ধান করেছেন। যুক্ত করেছেন একের সাথে অপরকে, রূপ নিয়েছে সার্থক সংস্কৃতির।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সংস্কৃতি চিন্তায় লোকসংস্কৃতি :

সার্থক সংস্কৃতির তিনটি ডাইমেনসনের অন্যতম লোকসংস্কৃতি। ভারতবর্ষের আদিধারা লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকচিত্র সবমিলে লোকসংস্কৃতি। এর চর্চা ও সংগ্রাহক গ্রাম্য লোকজন। আগেরকার যুগে ক্লাসিকাল সংস্কৃতির সাথে লোকের যোগাযোগ ছিল, ছিল ভাবের আদান-প্রদান। পরবর্তীতে তা সাহিত্যিকদের হাতে মার্জিত রূপ পায়। ক্লাসিক সাহিত্যের রূপ পায়। ক্লাসিকাল সাহিত্যেরও সাধারণীকরণ হয়ে তা আবার ফোকের রূপ নেয়। যেমন তুলসীদাসের রামায়ণ 'রামচরিত মানস' আজও জনপ্রিয়। তবে সব দেশে সব থাকে না। যেমন ইউরোপ থেকে ফোক শেষ হলেই শুরু হয় পপকালচার। তাঁর মতে এখনকার কালচার হচ্ছে বিজ্ঞান কেন্দ্রিক, 'Science oriented culture' এতে ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয় সভ্যতার ছাপ ও প্রভাব স্পষ্ট। ইংরেজী হটাতে চাইলেও করা যাবে না, কারণ এটা সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে। এর ঢেউ গ্রামে যাবে এবং সাথে যাবে যাবতীয় পপ কালচার। এর থেকে প্রাবন্ধিকের সংশয়, লোকসংস্কৃতি হয়তো আর আগের সেই আকারে থাকবে না। তবে লোকসংস্কৃতির অসুবিধা হল যা হারিয়ে যাচ্ছে, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা আর সংগ্রহ হচ্ছে না। বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার অর্থ দিলেও ভারতে নেই বলে সংশয় প্রকাশ করেন প্রাবন্ধিক। তবে বর্তমানে ভারতেও দিচ্ছে। প্রাবন্ধিক তাই আশা

করেন বাউল গবেষণা কেন্দ্র। মুণ্ডা, সাঁওতাল, নাগা, কোল, ভিল এদের বাদ দিয়ে কিছু করা যায় না। কারণ এদের সংস্কৃতি রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। মোট কথা লোকসংস্কৃতির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পরিবর্তমান সংস্কৃতি। প্রাবন্ধিক বলেন — লোকসংস্কৃতি এমন এক ভাণ্ডার যা এখনো নিঃশেষিত হয়নি, কখনো নিঃশেষিত হবে না। এই খনি থেকে মনি তুলে আনলে বিদগ্ধ মহলের উচ্চস্তরে সংস্কৃতিও নতুন প্রাণ পেতে পারে। যা কিছু চক চক করে তাই সোনা নয়। সোনার জন্য তিনি চেয়েছেন অন্তহীন অন্বেষণ, অন্তরতম অনুভূতি; প্রকৃতির সাথে সাযুজ্য। অর্থাৎ লোকসাহিত্যের সঙ্গে যদি আমাদের জীবন্ত যোগ না থাকে তাহলে ভদ্র সাহিত্য রক্তহীন, স্বাদহীন অগভীর হবে বলে জানান প্রাবন্ধিক। অথচ লোকসংস্কৃতির ইতিহাস কেউ জানে না, কিন্তু সকলের ইতিহাস এর মধ্যেই সংরক্ষিত। তাই একে রক্ষা করার জন্য প্রাবন্ধিক শেষ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদেরই এ কাজে এগিয়ে আসতে বলেছেন।

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের আশা ছিল ওপারের বাউলদের সঙ্গে এপারের বাউলদের এক সঙ্গে বসানো ও একই গান গাওয়ানো। কেননা, তাহলে প্রাবন্ধিক বুঝতে পারবেন সুরের ও কথার মিল কতদূর আর অমিল ঠিক কোনখানে। বাউল কবিরা হিন্দু না মুসলমান এই নিয়েও প্রাবন্ধিক একাধিক প্রবন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তবে মানবিক অন্নদাশঙ্কর যেহেতু হিন্দু মুসলিম মিলনে বিশ্বাসী তাই তিনি *লালন ও তাঁর গান* প্রবন্ধের ভূমিকাংশে বলেছেন—'' আমার এই বইখানি বর্ণপরিচয়। বর্ণপরিচয়ে কারো শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। যা হয় তা বিদ্যারম্ভ। চেষ্টা করেছি আগ্রহ জাগিয়ে দিতে। তার বেশী আমার সাধ্য নয়। গোলাম রহমান আমার কাছে যা প্রত্যাশা করেছেন তার যোগ্য হতে হলে আমাকে আরো পড়াশুনা করতে হবে, আরো গান শুনতে হবে, আরো মিশতে হবে, আরো ঘুরতে হবে। কিন্তু এ বয়সে আমি যদি এসব করতে যাই তবে আমার পরিকল্পিত উপন্যাস লিখবে কে? তবে হিন্দু মুসলমানের মিলন আমার চিরদিনের কাম্য। এ বই যদি মিলনের সহায় হয় তবে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আর সেইভাবে পূর্ণ হবে সাঁইজীরও উদ্দেশ্য। লালনের গানের সংখ্যা হাজার হাজার। তার থেকে চল্লিশটি নির্বাচন করা কি বৃথা চেষ্টা নয়? কিন্তু তার বেশী করতে গেলে সাধারণের পক্ষে গুরুপাক হতো। তা ছাড়া এমন বহু গান আছে যার কয়েক পঙ্‌ক্তি আমাকে মুগ্ধ করলেও বাকীটা ক্লান্তিকর। পুনরাবৃত্তিও প্রচুর। সাধারণ পাঠকের পক্ষে চল্লিশটিই যথেষ্ট। এখানে বলে রাখি যে এর একটি আমি কুমিল্লায় এক বৈষ্ণবীর কণ্ঠে শুনেছিলুম। তখন কিন্তু লালনের ভণিতা শুনিনি। গানটি একটু অন্যরকমও ছিল। 'এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।' অথচ এটি লালনের বলে অষ্টম খণ্ড 'হারামণি'র অন্তর্ভুক্ত। সেই সুবাদে এই বইয়েরও সামিল।''[৫]

এই প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধে লালন ফকির ছাড়াও অন্যান্য বাউলদের পরিচয় দিয়েছেন

একাধিক প্রবন্ধে। যেমন— *লালন তিরোধান শতবার্ষিকী, লালন স্মরণ, লালন জন্ম দ্বিশত বার্ষিকী, লালন স্মারক, অবিস্মরণীয় লালন।* ফকির লালন শাহ্, দরবেশ লালন সাঁই, লালন ফকির ও রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্যের সন্ধানে ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে লালন শাহ সম্পর্কে যে তথ্যগুলি দিয়েছেন তাতে মনে হয় তিনি লোকসাহিত্য প্রেমী, লোকসংস্কৃতি সন্ধানী। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন— ''সাহিত্য কখনো সম্পূর্ণতা পেতে পারে না যদি লোকসাহিত্য তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। আমি সেইজন্যে লোকসাহিত্য তথা লোক সংগীতের অনুরাগী।''[৬]

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় 'লোকসাহিত্যের সন্ধানে' নামক প্রবন্ধে বলেছেন— ''প্রবাসীতে সেকালে 'হারামণি' বলে একটি বিভাগ ছিল। তাতে কোনো মাসে একটি, কোনো মাসে একাধিক লোকমুখে প্রচলিত গান বা কবিতা বা ছড়া প্রকাশিত হতো। যাঁরা সংগ্রহ করে পাঠাতেন তাদের নাম ছাপা হতো। তাঁদের অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নেতা ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, যোগ দিতেন আরো অনেক।''[৭]

প্রাবন্ধিক যখন রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে লোকসংগীতের সন্ধানে আসেন ডক্টর আরনলড বাকে। হল্যাণ্ডের অধিবাসী, রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। তখন প্রাবন্ধিক মনসুরউদ্দীন সাহেবকে নিয়ে আসেন। এবং সেই বাঁকে'কে পরিচয় করান এক ফকির ও ফকিরিনীর সাথে। ফকিরিনী গান বাঁধে, আর বাকে সেগুলি রেকর্ড করেন। মনসুরউদ্দীন অবশ্য 'হারামণি'র খণ্ডে খণ্ডে সেগুলি বের করেন। ফকিরিনী ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তাঁর প্রথম গানটি ছিল সার্বজনীন।

''প্রেম করো, প্রেমের মর্ম জেনে
প্রেম করা কি কথার কথা রে
গুরু লহ চিনে।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারাই প্রেমের শিরোমণি
এক মরণে দু'জন মলো রে
প্রেমপূর্ণ প্রাণে।''

পরের লাইনগুলি মনে পড়ছে না। তার ভাব ছিল এই যে, প্রেমের তারে বাঁধা ছিলেন মোহাম্মদ আর আপনি খোদা।

অনুমান করতে পারি গানটি সুফী তথা বৈষ্ণব ভাবের সমন্বয়সূচক। তার গায়িকা কে তা তো জানা গেল, কিন্তু রচয়িতা কে তা জানবার উপায় ছিল না। কারণ গানের শেষে কোনো ভণিতা

ছিল না। সে সময় আমার ধারণা ছিল না সেই একই গান আমি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অবিভক্ত বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি শুনতে পাব। তবে তার মুসলিম অংশটি বাদ দিয়ে। চণ্ডীদাস ও রজকিনীকেই প্রেমের আদর্শ বলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রবাদ আছে যে, তাঁরা যেমন জীবনে একসঙ্গে ছিলেন তেমনি মরণেও একসঙ্গে গেছেন।"[৮]

অর্থাৎ বিদ্যা নয়, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ছিল তাদের সম্বল ও সম্পদ। বাউলদের সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের চিন্তাভাবনা এই রকম— ''যে ঐতিহ্য এঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে, এঁরাও বাঁচিয়ে রেখেছেন যাকে, সে ঐতিহ্য বৌদ্ধ, সহজিয়া, হিন্দু, বৈষ্ণব তথা মুসলিম সুফী মার্গের। সেসব মার্গেরও পন্থভেদ আছে। লালনের ছিল দরবেশ দীক্ষা। তা বলে সব ফকিরের দরবেশ দীক্ষা নয়। দরবেশ দীক্ষা হিন্দু সাধকেরও ছিল। তাতে তাঁর জাত যেত না। আর গেলেই বা কী! যে যার নিজের আস্তানায় থাকতেন সমাজের নাগালের বাইরে। গানই ছিল নেশা ও পেশা। বাউল আপন মনে গান করত, যারা শুনত তারা যে যা পারে দিত। সারাদিন সে যা সংগ্রহ করত তাই দিয়ে তার আস্তানা চলত। ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করত না। একই মনোভাব তার রচনার বেলায়। তার গান হচ্ছে বহতা নদী। বহতা নদীকে বাঁধ দিয়ে ধরে রাখলে তার জল আর তাজা থাকে না। তাজা জল যদি চাও তো বেঁধে রাখতে যেয়ো না। বাউলের তাই পুঁথিপত্র নেই। নোটবই নেই। ওরা কেউ সে কাজ করবে না। অন্য কেউ যদি করে তবে যে তারা অনুমোদন করে তা নয়। আমি শুনেছিলুম ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সংগ্রহে অসংখ্য বাউল গান আছে। সেসব তিনি প্রকাশ করছেন না।"[৯] কিন্তু বাউলদের গান প্রকাশ করা নাকি মানা আছে। তাদের গান হচ্ছে বহতা নদী। বহতা নদীকে বাঁধ দিয়ে ধরে রাখলে তার জল আর তাজা থাকে না। তাজা জল পেতে গেলে বেঁধে রাখা ঠিক নয়। তবুও —

''ক্ষিতিমোহনবাবু নিজেই 'প্রবাসী'র সেই 'হারামণি' বিভাগে বিগত বাউলদের গান প্রকাশ করেছিলেন। তাদের একজনের নাম গঙ্গারাম। গঙ্গারামের একটি গান আমি ক্ষিতিমোহনবাবুর মুখেই শুনি। মনসুরউদ্দীন সাহেব সেটি 'প্রবাসী' থেকে নিয়ে পুনরায় প্রকাশ করেছেন।

''পরাণ আমার সোঁতের দীয়া
(আমার ভাসাইলে কোন্ ঘাটে!)
আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার
আন্ধার নিশুইত ঢালা,
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরের
মালা (গো)
(তারার তলে কেবল চলে

নিশুইত রাইতের ধারা)

সাথের সাথী চলে বাতি,

নাইগো কূলকিনারা (গো)...”

ভণিতায় গঙ্গারামের বা অন্য কারো নাম নেই। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে ক্ষিতিমোহনবাবু গঙ্গারামেরই নাম বলেছিলেন।”[১০]

এই সব গানের সাহিত্যিক সৌন্দর্য আছে বলেই এসব গান সংগ্রহ করতে ও প্রকাশ করতে প্রাবন্ধিক আশান্বিত হয়েছেন। অন্যদিকে লালন ফকির ও রবীন্দ্রনাথ নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সুন্দর মন্তব্য করেছেন— ‘‘রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল প্রভাব একান্ত সীমাবদ্ধ। লালনের প্রভাব তো আরো কম। যেটুকু তিনি নিয়েছেন সেটুকু ওই মানুষতত্ত্ব। আর সেক্ষেত্রেও মানুষ বলতে তিনি যা বুঝেছেন তা মিস্টিক পর্যায়ে পড়ে, এসোটেরিক পর্যায়ে নয়। বাউলরা বেদ কোরান মানে না, মন্দির মসজিদ মানে না, পূজাপার্বণ রোজা নামাজ মানে না, দেবদেবী অবতার পয়গম্বর মানে না, সাকার বিগ্রহ মানে না, এমন কি ঈশ্বর আল্লাহকেও ডাকে না। তা বলে তারা নিরীশ্বরবাদী নয়। তাদের যিনি সাঁই তিনি আলেক মানুষ বা অলখ মানুষ। সকলের অন্তরেই রয়েছেন। অন্তরেই তাঁকে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় উপলব্ধিও তাই।”[১১]

অন্যদিকে বাউল যে হিন্দু, মুসলিম উভয়ই হতে পারে, সেকথাও প্রাবন্ধিক তুলে ধরলেন একটি প্রবন্ধে— ‘‘বাউল একটি ধর্ম নয়, একপ্রকার সাধনা। সেই সাধনার সাধকরা লোকচক্ষে হিন্দু হতে পারেন, মুসলমানও হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের মুখে যাঁর কথা শোনা যায় তিনি মানুষের অন্তরে স্থিত মানুষ। মনের মানুষ। এই দেহই তাঁর আধার। সাধনা করলে এই দেহেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়। বাউলদের এক এক মণ্ডলীর এক দীক্ষা। এমনি একটি মণ্ডলীকে বলা হয় সাঁই দরবেশ। এঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয় শাহ্ ফকির। সিরাজ শাহ্ ফকির বলে এক সাঁই দরবেশ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাউল সাধক। তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন তরুণ বয়সী হিন্দু কায়স্থ কর বংশীয় লালন। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে লালন নামে বহু ব্যক্তি আছেন। লালন বা লাল্লন কথাটির অর্থ লাল বা প্রিয় পুত্র। লাল রং নয়। লালনপালনও নয়। লালন কর দরবেশ দীক্ষা নিয়ে সাধনায় অগ্রসর হতে হতে দশ হাজার শিষ্যের গুরু লালন শাহ্ ফকির হয়ে একশো ষোল বছর দেহধারণ করেন। লোকে বলে সাঁইজী। তাঁর সমাধির পর আশি বছর কেটে গেছে। কুষ্টিয়াকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে এখনো তাঁর অসংখ্য শিষ্য। তাঁদের মুখে অজস্র গান। কিন্তু জোর করে বলতে পারা যায় না যে সব কটি গান অবিকৃত বা অবিমিশ্রিত বা সাচ্চা।

বাউলরা তত্ত্বকথা শোনান না। যা শোনাতে চান তা গানরূপে গেয়ে যান। সে সব গান

আগে থেকে রচনা করেন না, ভাব আসার সঙ্গে সঙ্গে সুরের ঝরণা থেকে ঝরে পড়ে। ঝরণার জলকে বেঁধে রাখলে সে জল হয় বদ্ধ জল। সেইজন্যে তাঁরা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত গানগুলিকে লিখে রাখেন না। যারা শোনে তারা মনে রাখে ও আর দশজনকে শোনায়। সেই দশজন শোনায় আরো একশো জনকে। এমনি করে শ্রুতিসূত্রে সে সব গান দেশময় ছড়িয়ে যায়।"[১২]

বাউল গান কতটা লোকসাহিত্য সে নিয়েও প্রাবন্ধিকের মন্তব্য বেশ জোড়ালো— ''বাউলের গান লোকসাহিত্য কি না এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। শ্রোতারা সাধারণ লোক, রচয়িতারাও সাধারণ ঘরের লোক। লালন নাকি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু বাউলদের সাধন তত্ত্ব বুঝতে পারে ক'জন? তাদের সাধনপ্রণালী আদৌ সহজ নয়। সাংকেতিক ভাষায় যেসব কথা বলা হয়েছে সে ভাষা বাংলা হলেও সুগম বাংলা নয়। সেই চর্যাপদের সময় থেকেই এই প্রকাশধারা প্রবহমান। পণ্ডিতেরা এর রহস্যভেদ করতে পারেন না, কারণ তাঁরা অভিধান পড়ে শব্দের অর্থ করেন। অভিধানে শব্দ থাকলেও তার গোপন অর্থ মেলে না। তার জন্যে যেতে হয় বাউলদের কাছে। তারাও লোকভয়ে খুলে বলে না। কেউ প্রকাশ করে দেয় এই ভয়ে তারা গানগুলো পর্যন্ত লিখে নিতে দেয় না। বলে, ''লিখে নিলে ঝরনার জলকে বেঁধে রাখা হয়। ওকে বয়ে যেতে দাও। হারিয়ে যায় যাবে। ভিতর থেকে নতুন ধারা ঝরবে।"

লালনের গানও একদিন হারিয়ে যাবে, যদি লিপিবদ্ধ না হয়। কিন্তু লিপিবদ্ধ করলে সে হবে বদ্ধজল। গুরুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য। অনড় অচল। লালন সেটা চাননি। নিত্য নতুন গান সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর প্রকৃতি। তিনি স্বাভাবিক। মুখে মুখে গান বানিয়ে তখনি শোনাতেন। শোধনের অবকাশ পেতেন না। ছন্দ মিল নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তা সত্ত্বেও যা হতো তা সাধনার দিক থেকে উচ্চকোটির। কবিতা হিসাবেও উচ্চাঙ্গের। সংগীত হিসাবে তো অপূর্ব। সুফী বা সহজিয়া বা বৈষ্ণব যে ভাবেরই হোক না কেন তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণে অসামান্য।"[১৩]

কিন্তু প্রাবন্ধিক সংশয় প্রকাশ করেছেন বাউলগানে যারা স্রষ্টা তারা যদি গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে, আখড়া বা আস্তানাগুলো যদি লোকাভাবে লুপ্ত বা অর্থাভাবে ধ্বংস হয়, বাউলকে বা বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দেবার জন্য যদি কেউ না থাকে, তাহলে মঙ্গলকাব্য যেমন আর রচিত হচ্ছে না তেমনি লোকসাহিত্য বা লোকসংগীত আর মুখে মুখে তৈরি হয়ে উঠবে না।

অন্যএকটি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক লালন শতবার্ষিকীর সম্পর্কে বলেন— '' 'লালন ফকির ও গান'। 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয় ১৩০২ সালের ভাদ্র সংখ্যায়। সেই প্রতিকৃতির সন্ধান এখনো মেলেনি। তবে সেটি ছিল অসম্পূর্ণ। বোধ হয় স্কেচ।

লালনের চেহারা সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক লালনপন্থী ফকির খোদাবক্স শাহ

(১৯৪০ সালে বয়স ৯৭বছর) উপেন্দ্রবাবুকে বলেন যে, লালনের মাথায় বাবরী চুল ছিল, মুখে ছিল লম্বা দাড়ি, একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন, মুখে অল্প বসন্তের দাগ, আয়ত চক্ষে এক গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কুমারখালির ভোলানাথ মজুমদার মহাশয়ও ঐরূপ বর্ণনা দেন। তিনি ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়িতে লালনকে কয়েকবার দেখেছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সরলা দেবীকে লিখেছিলেন, ''লালন নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী এবং প্রশান্তভাব দেখিয়া তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারা যাইত এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে ধর্ম-জীবনের প্রেমোন্মত্ততা মিলিত হইয়া তিনি যে নিরক্ষর তাহা যেন সহজে বুঝিতে পারা যাইত না।''

অক্ষয়বাবু লালনকে স্বচক্ষে দেখেননি। 'হিতকারী'র নিবন্ধকার তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তাঁর সাক্ষ্য এইরূপ—''লালন ফকিরের নাম কাহারও জানিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রংপুর, দক্ষিণে যশোহর ও পশ্চিমে অনেক দূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকিরের শিষ্য শুনিতে পাই; ইঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি! কুষ্ঠিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইঁহার একটি আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫/১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই। ...আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন, সম্প্রদায়ের ধর্মমতানুসারে ইঁহার কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই। শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকের স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। এই আশ্চর্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে, বাউল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। ... লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। অথচ সকল ধর্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণব ধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে, কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই, ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি, ইঁহার শিষ্যগণ ইঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা 'সাঞি' এই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নেমাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়?''[১৪]

মোটকথা এসব লোকসংগীতের চাহিদা থাকা দরকার। না হলে যোগানও থাকবে না। তাই এসব সংগীতের চাহিদা যাতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার যুগেও থাকে, পপসংস্কৃতির ঢেউ এসে যাতে লোকসংগীত শিল্পীদের শহরমুখী না করে তোলে, সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। না হলে কৃত্রিম বাউল গীতিকা বা কৃত্রিম ভাটিয়ালী গানই আমরা আজকাল উপহার পাবো। যতটুকু বা

লোকসংগীত শুনতে পাই, তাও আবার কৃত্রিমতায় ভরা। সুতরাং কৃত্রিমের চেয়ে অকৃত্রিমের সন্ধান ও সংরক্ষণ মনে হয়— আধুনিক সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে। বেঁচে থাকবে আধুনিক সাহিত্য।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সংস্কৃতি চিন্তায় ভাষা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতে, ভাষা একটি মাধ্যম। ভাষার সঙ্গে সমাজের অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক। ভাষা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে প্রেরিত হতে পারে কিন্তু তা জৈবিক উত্তরাধিকার হিসেবে নয়, সাংস্কৃতিক উপাদান হিসাবে, শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে। এক প্রজন্মের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও স্বপ্ন অন্য প্রজন্মের কাছে প্রেরিত হয়— যাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক অবনাগমন। তাঁর মতে, ধর্মের মতো ভাষাও এক প্রকার রাজনীতি। তিনি বলেন— ''ভাষা না হলে সাহিত্য হয় না, আগে ভাষা তার পরে সাহিত্য। তাঁর মতে, সরকারী ভাষা বিষয় কর্মের জন্য, সাহিত্যের ভাষা সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে। সীমার বাইরে যেতে হলে অন্য কিছু শিখতে হবে। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে লেখা *মাধ্যমের প্রশ্ন* ব্যক্তিগত পত্রে তিনি ভারতের বহুভাষিকতার সংকট ও ইংরেজিকে ব্যাপক সংযোগের ভাষা হিসাবে সংরক্ষণের চিন্তা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজি ও হিন্দির ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজীকেই অধিক উপযুক্ত মনে করেছেন।

ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি (১৯৬৭) নামক প্রবন্ধে জানান ভারতীয় ভাষাগুলির প্রত্যেকটিতে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছিল। সে জোয়ার সমুদ্রের জোয়ার। ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন তথা বিজ্ঞান এনেছিল সেই জোয়ার। না হলে রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি* (১৯১৩) নোবেল পেত না। আসলে ভাষাগুলির নব জন্মের মধ্য দিয়ে কীভাবে সংস্কৃতি এখন ভাষা ভিত্তিক হয়ে উঠেছে বা উঠতে যাচ্ছে, সেটাই তিনি দেখিয়েছেন। ভাষার স্বল্পতা মানেই যে সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা এতে তিনি বিশ্বাসী নন। ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতির বড়ো বিপদ হলো ভাষা ভিত্তিকতা মনে প্রাণে গেঁথে গিয়ে যদি প্রদেশের ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাস শুরু হয়ে রাজ্য ও দেশের সরকারী ভাষা হতে বদ্ধপরিকর হয়, তা হলে ইউরোপের মতো ভারতেও একদিন ভাষাভিত্তিক নেশন রাষ্ট্রের বহুধা বিভক্ত হবে। অর্থাৎ প্রাবন্ধিকের ভাষায়— ''ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি যদি অন্ধদের হাতে পড়ে তবে ধর্মান্ধরা যেমন দুই ভাগ করেছে ভাষান্ধরাও তেমনি বহুভাগ করবে।''[১৫]

সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনে কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ভাষার মেলবন্ধন কীভাবে ঘটে সে কথা বলেছেন— *আমাদের সংস্কৃতির বিবর্তন* নামক প্রবন্ধে। তাঁর মতে কেউ আর্য ভাষায় কথা বললেই আর্যবংশীয় হয় না। বাংলা ভাষা আর্য ভাষা, কিন্তু বাঙালী জাতি কি আর্য? অর্থাৎ আর্য জাতি অন্যান্য জাতির সাথে এক দেহে কীভাবে লীন হয়ে গেছে প্রাবন্ধিক সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। বিবিধের মধ্যে ঐক্যের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্রোত চির প্রবহমান, যেমন ইউরোপে, তেমনি ভারতে। এক

ভাষা অন্য ভাষার শূন্য স্থান- এভাবেই পূরণ করছে। আবার উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বিদ্বান ও বিদ্যার্থীর সমাগম হত ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এমন কি ভারতের বাইরে থেকেও। ফলে ধীরে ধীরে সংস্কৃতির বিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু *সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা* নামক প্রবন্ধে বলেন ভাষা ও জাতি এক নয়, ভাষা থেকে জাতি বা রেস বোঝা যায় না। ভাষা এক হতে পারে রেস অনেক হতে পারে। মোট কথা সারা ইতিহাস জুড়ে যেন মানব সমষ্টির মাইগ্রেশন চলে আসছে বলেই এরকম হচ্ছে। পাখি, মানুষ, তরুলতা, এমনকি ফুলেরও মাইগ্রেশন। যা স্বদেশী ভাবা যায়, সেটাও বিদেশী। প্রাবন্ধিক *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* নামক প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন অসিতকুমার ভট্টাচার্যের মতামত- তিনি মানব সংস্কৃতিতে বিশ্বাসবান। তিনি ধর্মমূলক সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে, ধর্ম মেলায় না পর করে দেয়। ধর্ম নয় ভাষার উপরেই তাঁর আস্থা। ভাষাই গোটা দেশকে জোড়া দিতে পারে। ভাষাগত সংস্কৃতিই বাঙালী হিন্দু মুসলমানকে এক নীড় করতে পারে। কিন্তু কোথায় যেন প্রাবন্ধিকের সংশয়। প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন ভাষা তো চিরকালই এক ছিল, তবে কেন সাত'শ বছরের যৌথ নীড় একরাত্রে ধ্বসে পড়ল। কারণ স্বরূপ তিনি মুসলমানদের আনুগত্যহীনতার কথাই বলেন। মুসলমানদের ধারণা ভারত নাকি হিন্দুদের দেশ। তার জন্যই হয়তো সৃষ্টি হলো পাকিস্থান। প্রাবন্ধিকের তাই বক্তব্য— ''আদমের শরীর থেকে হাড় নিয়ে যেমন হবা অর্থাৎ ইভ তেমনি ভারতের শরীর থেকে রক্ত মাংস নিয়ে পাকিস্তান।''[১৬]

অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই সব প্রবন্ধের মধ্যদিয়ে ভাষার নানান সমস্যা ও সমাধানের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে, ১৯৬১ সালে লেখা ('জয়শ্রী' সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লালা রায়কে লিখিত পত্রে ভাষা সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। যে প্রবন্ধের নাম 'ভাষা প্রসঙ্গে' তাঁর মতে— ''ধর্মের মতো ভাষাও এক প্রকার রাজনীতি। অথচ সাহিত্যের দিক থেকে বুনিয়াদী রাজনীতি নয়। একথা ঠিক যে ভাষা না হলে সাহিত্য হয় না, আগে ভাষা তার পরে সাহিত্য। ... বাংলা যখন সরকারী ভাষা ছিল না তখনো বাংলা সাহিত্য ছিল, যদি সরকারী ভাষা না হয় তা হলেও বাংলা সাহিত্য থাকবে। সরকারী ভাষা হওয়াটা জনসাধারণের পক্ষে দরকারী হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকের দিক থেকে বুনিয়াদী নয়।''[১৭]

অন্নদাশঙ্কর রায় বলার চেষ্টা করেছেন যে সরকারী ভাষার সাথে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত থাকে। সরকারী ভাষা বিষয়-কর্মের জন্য প্রয়োজন, আর সাহিত্যের ভাষা রসের জন্য সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য। তার কথায়— ''সারস্বত বাংলা ও সরকারী বাংলা এক ভাষা হলেও একই জিনিস নয়। আমরা সাহিত্য সাধকরা রসের সৌন্দর্যের জন্যে মানুষের মুখ থেকে কথা বেছে নিয়ে সাহিত্যের ভাষা গড়ি। আর ওঁরা সরকারী লোকরা বিষয় কর্মের জন্যে ইউটিলিটির জন্যে অভিধান থেকে আইনের বই থেকে শব্দ সংগ্রহ করে ভাষা গড়েন।''[১৮] স্বাধীন দেশে জনগণের ভাষা কেন সরকারী ভাষা

হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে তিনি বলেন— ''ইংরেজরাও এটা মানত বলে বাংলাকে আংশিকভাবে সরকারী ভাষা করেছিল। জনগণের বেশীর ভাগ কাজই তো আদালতে। সেখানকার সরকার স্বীকৃত ভাষা ছিল বাংলা।''[১৯]

অন্যদিকে ১৯৬২ তে লেখা *মাধ্যমের প্রশ্ন* একটি ব্যক্তিগত পত্র। লিখেছিলেন শ্রীআশিস সান্যালকে। এখানে তিনি ভারতের বহুভাষার সংকটের মধ্যেও ইংরেজিকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কেননা, যারা ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষার্থী তারা 'সর্বত্রচারী'। যারা বাংলা, অসমীয়া বা ওড়িয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তারা সর্বত্রচারী নয়। আবার পশ্চিমবঙ্গে যে সব পাঞ্জাবী বা তামিল বা গুজরাতী ছাত্র আছে তারা দাবী করবে নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ। তাঁর মতে— ''এতদিন সবাইকে একসূত্রে গ্রথিত করার মতো একটা সূত্র ছিল। এখন এক এক কলেজে এক এক ভাষা হবে মাধ্যম। পরীক্ষারও মাধ্যম হবে এক আধ ডজন। হট্টগোল অনিবার্য।''[২০] তাঁর শেষ প্রশ্ন—''কলকাতার মতো সর্বভারতীয় নগরে যদি সাত আটটি মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় ও তার ফলে যদি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তবে লোকে একদিন অতিষ্ঠ হয়ে বলবে, ''এর চেয়ে হিন্দী ভালো।'' হিন্দী এখনো আধুনিক চিন্তার বাহন হিসেবে দুর্বল।''[২১] *ভারতীয় সংহতি* (১৯৬২), শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র। এখানে বেশ কয়েকটি ভাষার সমস্যার কথা উঠে এসেছে। বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য ভিত্তিক ভাষার সমানাধিকার নিয়ে যে সমস্যা, তারই বিভিন্ন দিক প্রবন্ধিক সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর দিক থেকে বিবেচনা করেছেন এবং ইংরেজি ও হিন্দির মধ্যে আসলে দ্বন্দ্ব ঠিক কোথায় সেই দিকটিও অন্নদাশঙ্করের ভাষা চিন্তায় উঠে এসেছে।

স্বাধীনতার সংগ্রাম চলাকালীন কোনো অসুবিধে প্রাবন্ধিক লক্ষ্য করলেও স্বাধীনতার পরে এক এক পাওনাদার যে হাজির হচ্ছে, সেটা প্রাবন্ধিক বুঝতে পেরেছিলেন। কেউ রাজ্য ভিত্তিক ভাষার প্রশ্ন নিয়ে, কেউ পাকিস্তান পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। ''তেলেগুদের ঠান্ডা করার জন্য অন্ধ্র, তামিলদের ঠান্ডা করার জন্য মাদ্রাজ, কেন্নাডিগদের ঠান্ডা করার জন্যে মৈশুর, মালয়ালীদের ঠান্ডা করার জন্যে কেরল ইত্যাদি রাজ্য গঠিত বা পুনর্গঠিত হয় ... কিন্তু মাদ্রাজ হঠাৎ একদিন তামিলকে তার সরকারী ভাষা বলে ঘোষণা করল। তারপর থেকে একে একে প্রত্যেকটি রাজ্যই একটি ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দিয়ে রাজ্যস্থিত অন্যান্য ভাষাকে উপেক্ষা করে আসছে। এই নিয়ে আসামে ঘোরতর হাঙ্গামা বেধে গেল। ... তামিল যদি সরকারী ভাষা হয় তবে তার মানে দাঁড়ায় তেলেগুদের বাধ্য হয়ে তামিল শিখতে হবে। তামিল শিখে তামিলদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। ... কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি না টানলে গুজরাত হবে মরাঠাশূন্য, মাদ্রাজ হবে তেলেগু শূন্য, অন্ধ্রপ্রদেশ হবে তামিল শূন্য। এর নাম কি ভারত নামক নেশন? জাতীয়তাবাদের স্বরূপ কি এই?''[২২] এর পরে

প্রাবন্ধিক আক্ষেপ করে বলেছেন এমন হলে সৈন্যদলও হবে স্বতোবিভক্ত ও দুর্বল। এরপর প্রাবন্ধিক শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি ও হিন্দির কথা বলেছেন—

''সংবিধানে হিন্দিকে অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা বলেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যে কয়টি অনুচ্ছেদে তাকে সরকারী ভাষা করা হয়েছে, সেই কয়টি নিতান্তই সরকারী কাজকর্ম সংক্রান্ত। ... হিন্দির দাবী যতই সর্বগ্রাসী হবে, নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে মাতৃভাষার দাবীও ততই নাছোড়বান্দা হবে। বিশেষ করে তামিল ও বাংলার। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে যা বলেছি তামিল সাহিত্য সম্মেলন বা সঙ্ঘম্ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। ... কারণ বাংলা হিন্দির থেকে ততখানি দূরে নয় তামিল যতখানি। তামিল আর্যভাষাও নয়। কিন্তু বাংলা যথেষ্ট দূরে। এর সাহিত্য অনেক বেশী আধুনিক। এ জগতে দেশই একমাত্র সত্য নয়। যুগও সত্য। হিন্দির সঙ্গে বাংলার অন্তত আধ শতাব্দী ব্যবধান। যেমন জার্মানের সঙ্গে ফরাসীর।''[২৩] শেষপর্যন্ত প্রাবন্ধিক নেশনকে একসূত্রে গাঁথার কথা ভেবেছেন—

''ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, সুইজারলাণ্ড যেমন আমাদের বাংলা; বিহার, ওড়িশা, আসামও মোটামুটি তেমনি। ওরা যে কেন এক একটি নেশন হয়েছে, এরা যে কেন তা হয়নি, এর কারণ এরা এতদিন একছত্রাধীন ছিল; আর ওরা বহুদিন থেকেই বিভিন্ন ছাত্রাধীন। মোঘল সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর যদি ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হতো তা হলে এরাও (বাংলা, বিহার, ওড়িষা, আসাম) এক একটি নেশন হয়ে উঠত। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন যদি দুর্বল বা অপ্রিয় হয় তা হলে দেশ বহুভাগ হয়ে যেতে পারে। এক একটি রাজ্য এক একটি নেশন হয়ে দাঁড়াতে পারে। ... আমরা বহু সম্ভবপর নেশনকে একসূত্রে গেঁথে একটি মহাজাতি গঠনের ব্রত গ্রহণ করেছি।''[২৪]

এই তিনটি পত্রে ভারতের বহুভাষিকতার নানা সমস্যারও কিঞ্চিৎ সমাধানের সূত্র খুব সুন্দরভাবে প্রাবন্ধিক পরিবেশন করেছেন পত্র প্রেরকের কাছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পাঠক হিসাবে আমরাও সেই পত্র প্রাপকের ভাগীদার। ভাষার সংখ্যাগুরুর সংযম ও করণীয় এবং সখ্যালঘুদের আসলে কি করা উচিত— ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাবন্ধিক যুক্তি-তর্ক ও তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। ফলে পত্রগুলিও হয়ে উঠেছে প্রবন্ধ।

এবারে আসা যাক *সিঁদুরে মেঘ (১৯৬২)* প্রবন্ধের কথায়। এখানে হিন্দি-তামিল বিরোধের নিষ্পত্তিতে ইংরেজীর অবস্থান আলোচিত হয়েছে।

প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, তামিলদের কেন হিন্দির প্রতি বিরূপ মনোভাব। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন— ''ধর্মের মতো ভাষাও বিস্ফোরক হয়ে দেশ ভেঙে দিতে পারে। ভাষার দ্বন্দ্ব থেকেও অভিনব রাষ্ট্রের উৎপত্তি হতে পারে। সৈন্যসামন্ত দিয়ে একে রোধ করা যায় না। ভাবাবেগ

দিয়েও বাঁধা যায় না। খাদ থাকলে তাকে ভরাট করতে হবে।"[২৫] প্রাবন্ধিক মনে করেন যে নেশন গড়ে তুলতে হলে চাই সম্প্রীতি, অভয়, সমান ত্যাগ, সমান সুযোগ। কিন্তু নেশন গড়া যাঁদের লক্ষ্য তাঁদের কর্তব্য সন্দেহের বীজ যেন মনভূমিতে রোপন না করে। ইউরোপের ভাষা পরিস্থিতির উল্লেখ করে অন্নদাশঙ্কর রায় ভারতে হিন্দী-ইংরেজীর অবস্থানে ফরাসী-ইংরেজীর দ্বন্দ্ব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এই ভাবে—

''চল্লিশ বছর আগে যখন আমি কলেজের ছাত্র-তখন থেকেই আমি হিন্দীর অনুরাগী। স্বেচ্ছায় হিন্দি বই কিনেছি, পত্রিকার গ্রাহক হয়েছি। হিন্দিকে ফরাসী ভাষার মর্যাদা দিতে চেয়েছি। এখনো আমার সে ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটেনি। আমার আপত্তি এইখানে যে, হিন্দী প্রেমিকারা আমাকে আমার শর্তে চান না। চান তাঁদের শর্তে। তাঁদের মতে হিন্দি হবে ভারতের ফরাসী নয়, ইংরেজী। আমার মতে হিন্দি হবে ভারতের ইংরেজী নয়, ফরাসী। হিন্দি যদি ইংরেজীর উত্তরাধিকারী হয় তবে আমাদের উপর আধিপত্য করবে। তার সেই অসপত্ন অধিকার তামিলরা কোনোদিনই মেনে নেবেনা।"[২৬]

অন্য একটি প্রবন্ধ হল *ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত* (১৯৬২)। অবশ্যই ভাষা সম্পর্কিত। শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে যে দ্বিমত— তা থেকেই এই প্রবন্ধের সূত্রপাত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু কী করে ভারতীয় জনমন এই টাকা খরচ করবে। ভারতীয়দের এক পক্ষে সংস্কৃত, ফরাসী ও আরবীর সংরক্ষকগণ। অন্যদিকে ইংরেজীর প্রবর্তকগণ। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীমূলক হবে, না ইংরেজীমূলক? কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীয় শিক্ষার মাধ্যম কী হবে— ইত্যাদি প্রশ্ন প্রাবন্ধিক প্রবন্ধের মধ্যে উত্থাপন করেছেন। এবং যুক্তিও দিয়েছেন বিচারকের মতো। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীর মধ্যে মিল ও অমিল ঠিক কোথায়— সেই দিকটি প্রাবন্ধিক দেখাতে চেয়েছেন—

''মেকলের সভাপতিত্বে একটি কমিটির অধিবেশন হয়। তাতে উভয় পক্ষেই সমান ভোট। মেকলে তাঁর কাস্টিং ভোট দিয়ে ইংরেজী প্রবর্তকদের জিতিয়ে দেন। তারপর থেকে ইংরেজী শিক্ষা সরকারী অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সর্বত্র প্রসারিত হয়। ইংরেজী স্কুলগুলিতে বাংলাকেও স্থান দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলাও হয় ইংরেজির শরিক ও মিত্র।... স্কুল পাঠ্য বিষয় ও নিচের দিকের মাধ্যম হয়ে বাংলারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তা হলে দেখা যাচ্ছে এক নৌকায় সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী। আরেক নৌকায় ইংরেজী ও বাংলা।"[২৭] প্রাবন্ধিক আরো বলেছেন যে সরকার যখন ইংরেজী তথা বাংলার পক্ষ নেয় তখন বাংলা খবরের কাগজগুলি জয়ধ্বনি দেয়। সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যদি বিপরীত হতো তাহলে বাংলা সাহিত্যেও আধুনিক যুগে পদার্পণ ঘটত না। শুধুমাত্র বাংলা কেন, হিন্দী, উর্দু, গুজরাতী-মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি কোনো সাহিত্যেরই

আধুনিক পর্যায় আরম্ভ হতো না।"[২৮] আসলে ইংরেজী শিক্ষা দেশবাসীর মনে কীভাবে স্বাধীন চিন্তার জাগরণ ঘটিয়েছিল প্রাবন্ধিক সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু ইংরেজীকে তুলে দিলে তার জায়গায় কোন ভাষা আসবে? সংস্কৃত, বাংলা? বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময়ই বাইরের ছাত্রদের কথা ভেবে ইংরেজীও ছিল। ''রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থাপিত হয় কলকাতা মডেলের কলেজ"[২৯] বিশ্বভারতী যখন স্বাধীন ভারতের পার্লামেন্টের আইন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে যেহেতু টাকা আসে, তাই চাপ পড়ে ইংরেজীর জায়গায় হিন্দীকে মাধ্যম করতে হবে। কিন্তু ''অধিকাংশের মত— ইংরেজী মাধ্যম বহাল রাখা" প্রাবন্ধিক শেষ পর্যন্ত বোঝাতে চেয়েছেন ইংরেজীর গুরুত্ব। প্রাবন্ধিকের মতে ইংরাজী শিক্ষা— ''মানুষের মনে অলক্ষে সঞ্চারিত হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবিকতা, গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারবোধ। ... রামমোহন রায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বদলে আর একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যাঁরা নেবেন তাঁরা যেন ভারতের সনাতন দুর্বলতার কথাটাও গণনার মধ্যে আনেন। বিশেষত বাঙালীর।"[৩০]

১৯৬২ সালে ভাষা সংক্রান্ত এক বহু আলোচিত প্রবন্ধ *যে দেশে বহুধর্ম- বহুভাষা* প্রবন্ধটি। প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত থাকায় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা এবং ধর্ম— প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁকে ভাবিয়েছে বার বার। ভারতবর্ষের ধর্ম ও ভাষার যে অবস্থা, এই বহুভাষিক ও ধর্মের দেশে নানা সমস্যার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে বার বার। ভাষা ও ধর্মের সমস্যা ও সমাধানের ভাবনাজাত ফসল এই প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যগুলি হল—

১. যে দেশে বহু ধর্ম সে দেশের মূলনীতি কী?

২. যে দেশের বহুভাষা সেদেশের মূলনীতি কী?

৩. সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর ভাষা সমস্যা

৪. একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করার সমস্যা

৫. একটি দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সমস্যা

৬. হিন্দি, ইংরেজী ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সুবিধা ও অসুবিধা

প্রাবন্ধিকের মতে যে দেশের বহু ধর্ম, তার মূল নীতি কী? এ প্রশ্নের উত্তর পাকিস্তান ও ভারত নিজের মতো করে দিয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে—

''পাকিস্তানের অধিকাংশের ইচ্ছা অনুসারে স্থির হয়ে গেছে পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। সেই যুক্তি অনুসরণ করলে ভারত হতে পারত হিন্দু রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত করল অপর একটি যুক্তির অবলম্বন। ভারতের মতে সব ধর্মই সমান, সব ধর্মই সত্য, সংখ্যাগুরুর মুখ চেয়ে একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলে আর সব ধর্মের উপর অবিচার করা হবে; সুতরাং সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু

নির্বিশেষে সর্বোদয়ের বিচারে সকলের প্রতি সমদর্শিতার খাতিরে ভারতকে হতে হবে সেকুলার স্টেট। যে রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।"[৩১] ভারত সেকুলার স্টেট হয়ে অবশ্য বর্মা ও পাকিস্তানের দশা এড়িয়েছে বলে মনে করেন প্রাবন্ধিক। গণতন্ত্রের শক্ত ভিত নির্ভর করে সেকুলার স্টেট যত দৃঢ় হবে তার উপর। আবার একটা দেশের একটাই রাষ্ট্র ধর্ম হবে এ ধারণা ইউরোপেও ছিল বলে মনে করেন প্রাবন্ধিক। এরপরেই প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন— যে দেশের বহু ভাষা সে দেশের মূল নীতি কী হবে? অবশ্য বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ড এর উত্তর একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। ১৮৩০-এ বেলজিয়াম নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। রাষ্ট্র-ভাষা হয় ফরাসী। দশ বছর পরেই ফ্লেমিশদের দাবি, তারাও তো বেলজিয়ান। তবে তাদের ভাষা কেন ফরাসীর মর্যাদা পাবে না। তাই ১৮৯৮ সালে আইন করে ফরাসী ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাকেই বেলজিয়ামের ন্যাশনাল ভাষা রূপে সমান স্থান দেওয়া হয়। এখন সে দেশের রাষ্ট্র ভাষা দুই। দুটোতেই সরকারী কাজ কর্ম চলে। অন্যদিকে সুইজারল্যাণ্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্রে মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের ন্যাশনাল ভাষা হবে জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান। যদিও এই তিনটি ভাষাই সরকারী কাজকর্মের জন্য।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্র ভাষা হবে এই ধারণাটা খুবই ভালো। কিন্তু প্রাবন্ধিক বলেছেন— ''এটার সত্যতা নির্ভর করছে সকলের সম্মতির উপরে, সুবিধার উপরে, ন্যায়বোধের উপরে।"[৩২] প্রাবন্ধিক এমনও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ভারত যদি 'ছত্রভঙ্গ' হয় সেটা কিন্তু ভাষার ইসুতেই হবে। প্রাবন্ধিকের মতে— ''তর্কটা হিন্দি বনাম ইংরেজী নয়। ইংরেজীকে সরানোর পরে ঘোরতর বিবাদ বেধে যাবে। তামিলরা হিন্দিকে মানবে না, নাগারা মানবে না, কাশ্মীরীরা মানবে না। বাঙালীরাও মানবে না।"[৩৩] আসলে তর্কটা হলো হিন্দী বনাম তামিল-বাংলা- পাঞ্জাবী ইত্যাদি। প্রাবন্ধিকের মতে— ''হিন্দি হবে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা, এর মানে হিন্দি হবে সারা ভারতের একচ্ছত্র ভাষা। যাদের মাতৃভাষা হিন্দি নয় তারা হিন্দি শিখতে গিয়ে দেখবে যে, প্রত্যেকটি হিন্দিভাষী শিশু জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যেমন জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে থাকতো প্রত্যেকটি ইংরেজ শিশু।"[৩৪] প্রাবন্ধিক বলেন সব কয়টি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চাই। না হলে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করতে হবে যার ফলে সকলের ন্যায় বোধ চরিতার্থ হবে।

প্রতিযোগিতার ভাষা বা পরীক্ষার ভাষা হিসেবে হিন্দীতে যতটা সুবিধা হবে, তার থেকে ইংরেজিতে অনেকটাই বেশি সুবিধা হবে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। যেখানে হিন্দি চলে না সেখানে ইংরেজীও চলে। হিন্দিকে প্রতিযোগিতার মাধ্যম করলে বাংলা, তামিল, তেলেগু, কন্নাডিগ, মালয়ালমকেও করা উচিত। প্রাবন্ধিক মনে করেন— ''একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। এটা একভাষী দেশের বেলাই খাটে। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এটাকে খাটাতে যাঁরা চাইছেন

তাঁরা মনে মনে ইংরেজীরই নজির অনুসরণ করেন। ... আমরাও তো দেখছি হিন্দি শিখতে ইংরেজীর চেয়ে কম শক্তি খরচ হলেও হিন্দিতে শেখবার যোগ্য বিষয় অল্পই আছে, ইংরেজীতে বিস্তর। ... দেশের লোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে হিন্দি আমাদের শিখতেই হবে।"[৩৫] তাহলে মূল সমস্যাটা কোথায়? ইংরেজী ও হিন্দী-দু'পক্ষের ভোট সংখ্যা প্রায় সমান সমান হয়। হিন্দির সঙ্গে ইংরেজীর সামান্য একটিমাত্র ভোটের ব্যবধান। ''এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দি ইংরেজী দুটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল। ... আমাদের সংবিধানে কোনো ভাষাকেই 'রাষ্ট্র ভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা' বলে আখ্যাত করা হয়নি। হিন্দিকে বলা হয়েছে 'সরকারী ভাষা'। সংবিধান যদি সংশোধন করা হয়, তবে ইংরেজীকে বলা হবে 'সহচর সরকারী ভাষা।"[৩৬]

ইংরেজের দেশে ইংরেজী পিছিয়ে পড়লে অর্ধ শতাব্দীকাল একটা মরা সাহিত্য কাঁধে করে কে বেড়াবে? প্রাবন্ধিকের মতানুযায়ী ইংরেজি শিখতেই হবে এমন কোন কথা নেই। শিখলে ভালো, না শিখলে পশতাবে। প্রাবন্ধিক শেষ পর্যন্ত সমস্ত সমস্যার সমাধানের একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন এইভাবে— ''ইংরেজীর দীপশিখা নিবে গেলেই যে হিন্দির দীপশিখার, বাংলার দীপশিখার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির দীপশিখার দেওয়ালি হবে এটা এক প্রকার নঞর্থক চিন্তা। বরং ইংরেজীর দীপ যতক্ষণ জ্বলছে জ্বলতে দাও, তার সাহায্যে নিজেদের দীপ জ্বালিয়ে নাও। ফুঁ দিয়ে তাকে অকালে নিবিয়ে দিলে পরে হয়তো দেখবে নিজেদের দীপও নিবু-নিবু। দেওয়ালি হবে, না কালীপূজা হবে, কে এখন থেকে ভবিষ্যদ্বানী করবে?"[৩৭]

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পত্রই-*মাতৃভাষা*। যা প্রবন্ধের পর্যায়ে পড়ে। হায়দ্রাবাদে সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটাই *মাতৃভাষা* নামক একটি পুস্তিকা অন্নদাশঙ্করকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্যছিল শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষাই হওয়া চাই। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রচুর সমাদর থাকায় এক সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। আসলে শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত তা নিশ্চয় দীর্ঘদিন থেকেই চলছিল এক দ্বন্দ্ব। এই অবস্থায় প্রাবন্ধিক হিন্দি, বাংলা, ইংরেজী ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলির গুরুত্ব আসলে কোথায়, তা এই পত্রপ্রবন্ধে তুলে ধরেছেন—

ক. ''বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ইংরেজদের আমলেও ছিল।"[৩৮]

খ. মাতৃভাষায় শিক্ষাদানই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে আজ এই মুহূর্তে কোটি কোটি বালক-বালিকাকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করতে পারা যায়। এর জন্যে শুধু এইটুকু করলেই যথেষ্ট হবে যে শিক্ষকদের বা অধ্যাপকদের নির্দেশ দেওয়া হবে ইংরেজী বই দেখে মাতৃভাষায় পড়াতে ও

পরীক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হবে মাতৃভাষায় প্রশ্ন করতে, উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে। পরে ইংরেজী বইয়ের বদলে মাতৃভাষায় বই লিখিয়ে নেওয়া হবে।''[৩৯]

গ. ''স্বাধীনতার পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ জনগণের জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যম বরাদ্দ করেছে। কিন্তু ইংরেজী মাধ্যম নিষেধ করে দেয়নি। কলকাতা শহরেই অনেকগুলি নতুন স্কুল হয়েছে, যেখানে ইংরেজীতে পড়ানো হয়।''[৪০]

ঘ. 'ইদানীং শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে বাংলা মাধ্যমের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ইংরেজী মাধ্যমও প্রবর্তিত হয়েছে।'[৪১]

ঙ. 'ইংরেজীতে পাঠ্যপুস্তক অসংখ্য। মাতৃভাষায় অত নয়।'[৪২]

চ. 'যে দেশে হিন্দিভাষীর সঙ্গে তামিলভাষীর প্রতিযোগিতা, বঙ্গভাষীর সঙ্গে উর্দুভাষীর প্রতিযোগিতা, সে দেশে ইংরেজীকে কতক লোক শত্রু না ভেবে মিত্র ভাববেই। জাপানে বা জার্মানীতে এ সমস্যা নেই, কারণ ভাষা তাদের আমাদের মতো চোদ্দ-পনেরোটা নয়, একটাই।'[৪৩]

ছ. 'মাতৃভাষার মাধ্যম বড়জোর পশ্চিমবঙ্গের ফলপ্রদ হবে, কিন্তু সারাভারতে?'[৪৪]

অবশেষে প্রাবন্ধিক শিক্ষার মাধ্যম আসলে কেমন হওয়া উচিত— তার একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন— ''আমি বলব, এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা মাধ্যম হোক। কোনোটার তামিল, কোনোটার তেলেগু, কোনোটার হিন্দি, কোনোটার বাংলা। সেই সঙ্গে কোনো কোনোটার ইংরেজী। যার বদলির চাকরি তাদের ছেলে মেয়েরা ইংরেজী পছন্দ করবে।''[৪৫]

ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রশ্ন প্রবন্ধে, ইংরেজীর স্থানে হিন্দি এবং ছাব্বিশে জানুয়ারীর *উত্তর* প্রবন্ধে হিন্দির অমঙ্গল দিক ঠিক কোথায় তার আলোচনা করেছেন। ছাব্বিশে জানুয়ারির *প্রশ্ন* নামক প্রবন্ধে বলেন ''ভারতের ভাষাগুলিকে 'আঞ্চলিক ভাষা' বলে আখ্যায়িত করা সমীচীন নয়। কারণ এটা সত্য নয়। অসত্যের উপর দাঁড় করালে একটা 'নেশন' দাঁড়াতে পারে না। জাতীয় সংহতি যত বড়ই হোক না কেন, সত্য তার চেয়েও বড়।''[৪৬]

উপসংহারে এসে প্রাবন্ধিক প্রবন্ধের মূল সুর আমাদের শোনালেন—

''ভাষা নিয়ে মীমাংসা এখনো হয়নি, ওভাবে হবেও না। সামনের ছাব্বিশে জানুয়ারী তারিখে ইংরেজীকে 'রিপ্লেস' করতে গিয়ে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দি প্রভৃতি ভাষা যে নতুন অধ্যায়টি আরম্ভ করতে যাচ্ছে সেটি 'শুভায়' কিনা ভবিতব্য জানে। ইংরেজী তো চলল, কিন্তু তার ছেড়ে যাওয়া জমিতে দখল নিতে যারা আজ এখনি উদ্যত তারা নিজেদের মধ্যে একমত না হলে পরে এর লাঠি ওর পিঠে পড়বে।''[৪৭] অন্যদিকে *ছাব্বিশে জানুয়ারীর উত্তর* প্রবন্ধে বলেছেন—

''আমরা যে হিন্দীকে আমাদের একমাত্র সরকারী ভাষা বা রাষ্ট্র-ভাষা বা জাতীয় ভাষা করার

জন্যে ব্যস্ত হয়ে ২৬ শে জানুয়ারি ১৯৬৫ দিন ধার্য করেছিলুম এটার মূলে ছিল ভাষাগত ঐক্যের উপর বিশ্বাস।"[৪৮]

তিনি অবশেষে বলেছেন— ''আমাদের এই প্রজাতন্ত্রে রাজভাষা থাকবে কেন? রাজভাষা যদি থাকে তো রাণী ভাষাও থাকা উচিত। নইলে রাজা একা নিঃসঙ্গ বোধ করবেন। যতদূর দেখতে পারছি দুটো ভাষাই যোগাযোগের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে। তা বলে অন্যান্য ভাষাকে শুধু সামন্ত ভাষা করে রাখলে চলবে না। তারাও সমান মর্যাদার অধিকারী হবে।"[৪৯]

আসলে তিনি ভাষাকে একটু অন্যভাবে দেখেছেন। তিনি ভাষা নিয়ে সকলকে আত্মসমালোচনা করার কথা বলেছেন। কারণ, সবকটা ভাষাই জনগণের সেবার ভাষা। মিলনের ভাষা।

অন্যদিকে উল্টোদৌড় আর কিছুই না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জীবনের উল্টো দৌড়ের ঘটনা। সত্যিই দৌড়খেলা আর বুদ্ধির দৌড়ের পার্থক্যটা এই প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। আসলে জিন্নাহর ভাবনাটা ছিল ভারতের অতীতের দিকে। তাই কায়দে আদম জিন্না উল্টো দিকে দৌড়তে আওরাৎ জেবের যুগে পৌঁছে যান। বাজিতে জিতেও যান। প্রাবন্ধিকের মতে—

''মাতৃভাষা যে ক্ষেত্রে সরকারী ভাষা সেক্ষেত্রে লোকে সরকারের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে। ... বর্তমান পর্যায়ে গণ্ডগোলটা ভারত সরকারের সরকারী ভাষা কোনটা হবে তাই নিয়ে। হিন্দি হলে অর্ধেক লোক একাত্মতা অনুভব করবে। তাদের বেলা একাত্মবোধ ও ভাষাত্মবোধ সমার্থক শব্দ। ... আমাদের হয়েছে উভয় সংকট। ইংরেজ আর ইংরেজী একই জিনিস নয়। সমস্ত গোণ্ডগোলটার মূলে এই রজ্জুতে সর্পভ্রম করে দৌড়। উল্টো দৌড়।"[৫০]

এছাড়াও *ভাষা সঙ্কট* ও *দুই সত্য* প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যও তাই। *একীয়তা* নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেন—

''আমরা এতদিন যে ভারতের ধ্যান করে এসেছি সে ভারত একটি নেশন-সমবায় নয়, একটি ধর্ম নিরপেক্ষ ভাষানিরপেক্ষ মতবাদ নিরপেক্ষ নেশন। ... এক একটি রাজ্যের সঙ্গে এক একটি ভাষার একীয়তা ঘটলে তার পরিণাম হবে এই।

''মহারাষ্ট্রের জন্যে মারাঠী" বদলাতে বদলাতে হবে ''মারাঠী ভাষীদের জন্যে মহারাষ্ট্র।" তেমনি ''গুজরাতের জন্যে গুজরাতী" বদলাতে বদলাতে হবে ''গুজরাতী ভাষীদের জন্যে গুজরাত"। তেমনি ''বঙ্গভাষীদের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ", ''তামিল ভাষীদের জন্যে মাদ্রাজ", ''হিন্দি ভাষীদের জন্যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ"। রাজ্যের জন্যে ভাষা এটা ঘুরে গিয়ে হবে ভাষার জন্যে রাজ্য। ... একই প্রকার চিন্তা বিপর্যয় ঘটবে আরো উপরের স্তরে। ''ভারতের জন্যে হিন্দি"

ছুঁচ হয়ে ঢুকছে। ফাল হয়ে বেরোবে ''হিন্দির জন্যে ভারত, হিন্দি ভাষীদের জন্যে ভারত।''[৫১]

এছাড়াও ভাষা বিষয়ক অনেক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক তাঁর সুচিন্তিত মত উত্থাপন করেছেন যুক্তি দিয়ে। নানা উদাহরণের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন বহুভাষিক দেশের সমস্যা ও সমাধানের উপায়। তবে তিনি একাধিক দেশের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং সেই সব দেশের ভাষাগত সমস্যার সাথে ভারতের মিল-অমিল ঠিক কোথায় সেটিও তুলে ধরেছেন। কখনো কখনো আক্ষেপও করেছেন ভাষাগত সমস্যা নিয়ে। তবে ভাষাগত ঐক্যে প্রাবন্ধিক বিশ্বাস করেন বলেই বলতে পারেন ধর্ম জাতিগত আর ভাষা সমাজগত বন্ধন। আর সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনেই ভাষাগুলির মধ্যে মেলবন্ধন হতে থাকে।

অন্নদাশঙ্করের সংস্কৃতি চিন্তায় ধর্ম

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিজীবন নামক অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে তিনি বহুধর্মের মানুষদের সংসর্গে বাল্যকাল থেকে বড়ো হয়েছেন। ধর্মীয় চিন্তাভাবনার উদারতার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, সবুজপত্র, টলস্টয় প্রমুখের আলোতে উজ্জ্বল মানবিকতার ছাপ তাঁর বহু প্রবন্ধে মেলে। অহিংসা, অদ্বেষ ও প্রেম ছিল প্রাবন্ধিকের জীবনের মূলমন্ত্র। মানুষকে হিন্দু বা খ্রিস্টান বা মুসলমান বলে বোঝানো যায় না। মানুষের ধর্ম যে কয়েকখানি শাস্ত্রে নিবদ্ধ নয় এটা অন্নদাশঙ্কর রায় বুঝেছিলেন। তিনি মানবিকবাদী। ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে তার কোন বিরোধ তিনি দেখেন না। প্রচলিত ধর্ম তত্ত্বের সঙ্গে বিরোধ দেখলেই তিনি মানবিকবাদকেই শ্রেয় মনে করেন।

তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী তবুও একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন যে এক কালে তিনি নাকি ঈশ্বরেরও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু পরে ফিরে পান সেই বিশ্বাস। তার পরেই আবার বলেন— মূর্তিপূজায় অবিশ্বাসী হলেও শিল্প রক্ষায় বিশ্বাসী। দুর্গা পুজো উপলক্ষে যে বাংলা সাহিত্য জগতে সৃষ্টিশীলতার প্রয়াস, তাকেও তিনি ধর্মের একটি ইতিবাচক দিক মনে করেন।

ধর্মজিজ্ঞাসা নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—''সর্বধর্ম সমন্বয় মস্ত বড়ো কথা। সে রকম কোনো আদর্শ আমি অঙ্গীকার করিনি। কিন্তু সব ধর্ম থেকেই সার সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। সেটাই আমার আদর্শ। এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে কিছু না কিছু অন্যধর্মের লোকের গ্রহণযোগ্য উপাদান নেই। তা বলে সব কিছুই অন্যর গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যদি হত তবে ধর্মে ধর্মে বিরোধ বাঁধত না। অথচ বেঁধেছে দীর্ঘকাল ধরে। এক খ্রীস্টধর্মেরই শাখায় শাখায় কী সংঘাত!
উত্তর আয়ারল্যাণ্ড আজও তার সাক্ষী। একই ঈশ্বর, একই ত্রাণকর্তা, একই শাস্ত্র, তা সত্ত্বেও হিংসা-প্রতিহিংসা। কেউ যেন না মনে করেন যে হিন্দুরা এর ঊর্ধ্বে। বৌদ্ধ ও জৈনদের উপর একদা কম অত্যাচার হয়নি। ওরা যদি নিতান্ত মুষ্টিমেয় না হত তা হলে ওদের নিয়ে বিবাদ আজও বাধতে

পারত। কারণ, ওরা ঈশ্বর মানে না, অবতার মানে না, অমরত্ব মানে না। ব্রাহ্মণকেও মানে না। যেখানে ও যখন ওদের সংখ্যার জোর ছিল সেখানেও তখন ওরাও প্রতিরোধ করেছিল। ওদের সঙ্ঘশক্তি দুর্বল না হলে ওরা এমন দুর্বল হত না। নানা কারণে ওদের সঙ্ঘ ভেঙে যায় বা খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। তাছাড়া রাজশক্তিও হাতছাড়া হয়।"[৫২] মোট কথা সর্বধর্মে সমন্বয় বা সমভাব বলে মনকে চোখ ঠারা যায় কিন্তু বাস্তবে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেকিউলারিজমকে ভারতের জন্য রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে মনে করে প্রাবন্ধিক। অন্নদাশঙ্করের ধর্মচিন্তার তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। সেকিউলারিজম বা রাষ্ট্র থেকে বিযুক্ত ধর্ম। ব্যক্তিসম্পন্ন মানুষের বিশ্বাসযোগ্য ধর্ম বিচারশীল জিজ্ঞাসা ও সন্ধানের দ্বারা চালিত। অপরটি মঙ্গলও মানুষের উপর বিশ্বাস। একারণেই প্রাবন্ধিক মনে করেন, সত্যের অন্বেষণই ধর্মের অন্তঃসার, আর তার সাথে প্রেম ও সৌন্দর্যের অন্বেষণ। আর সেটা অবশ্যই ন্যায়ের অন্বেষণ।

ধর্মের সাথে সংস্কৃতির যোগসূত্রে বিশ্বাসী প্রাবন্ধিক। তবে সবধর্মের লক্ষ্য এক হলেও বৈশিষ্ট্য কিছুটা আলাদা। ধর্ম আলো বাতাসের মতো সম্প্রসারণশীল, দেশের চারদিকে বেড়া দিয়ে তাকে আটকানো যায় না। যেখানে ধর্মের বন্ধন নেই, সেখানে সংস্কৃতির বন্ধন থাকতে পারে না বলেই বিশ্বাস প্রাবন্ধিকের। কেননা মনসার ভাসান, বেহুলার কাহিনী, রাধা-কৃষ্ণের লীলা, লক্ষ্মীর পাঁচালি, শিবের গাজন, নবান্ন প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে মাতায়। আর এখানেই সংস্কৃতির টান। *আমাদের সংস্কৃতি* (১৯৮৪) সংস্কৃতির বিবর্তন গ্রন্থের অন্তর্গত নামক প্রবন্ধে তিনি জানান— বালি দ্বীপের হিন্দুরা কেউ সিংহলের হিন্দুদের মতো ভারত থেকে দেশান্তরিত নয়। তারা স্বেচ্ছায় হিন্দু বা বৌদ্ধ হয়েছিল, পরে মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়। কিন্তু ধর্মে বিভিন্ন হলেও সংস্কৃতিতে এক ও অভিন্ন। সে ক্ষেত্রে তারা সকলেই হিন্দু ঐতিহ্যের অনুসরণ করে এসেছে। বালি দ্বীপের লোক ধর্মে হিন্দু, সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সংস্কৃতিতে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী। আর জাভা দ্বীপের লোক ধর্মে মুসলমান সমাজে বর্ণাশ্রম বিহীন, সংস্কৃতিতে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী। মোট কথা আত্মীয়টা ধর্ম থেকে নয়, সংস্কৃতি থেকে। আর সংস্কৃতি যদিও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আসলে নানা জাতির ও ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছিল সংস্কৃতির মূল উৎস ভূ-খণ্ডেই। ধর্মের সাথে সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক আছে বলেই চীন-জাপান-ভারত, আরব, ইরান প্রভৃতির সাথে বৌদ্ধ ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম যোগসূত্র রচনা করতে পেরেছে বলে জানান প্রাবন্ধিক। তার বড় প্রমাণ তাজমহল, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, উর্দু ভাষা। প্রাবন্ধিক *সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা* নামক প্রবন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন এই ভাবে— ধর্ম যদি সর্ব গ্রাসী না হয়, তবে ধর্মও বাঁচবে, সংস্কৃতিও বাঁচবে, রাজনীতিও বাঁচবে, অর্থনীতিও বাঁচবে। তবে *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* নামক প্রবন্ধে সংশয় প্রকাশ করে বলেন— ধর্মের

সঙ্গে সংস্কৃতির অসামঞ্জস্য দূর না হলে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির মিলন ভাসা ভাসা হবে। ভাষাগত ঐক্য থাকলেই কি মনের মিল হয়? তাহলে তো ইংরেজ মার্কিন পৃথক হত না। মোট কথা পুণর্মিলন এখন স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয় প্রাবন্ধিকের কাছে। তবে তার জন্য হাল ছাড়েননি প্রাবন্ধিক, কারণ তিনি শিল্পি। আর তিনি শিল্পী বলেই ধর্মকে দেখেন নানান দৃষ্টিকোণ থেকে। ধর্মই জীবিকাকে জীবন্ত করে। আর জীবিকাকে জীবন্যাস করে ধর্ম বিশ্বাস। না হলে মানুষ অখণ্ড জীবনের স্বাদ না পেয়ে মরমে মরে মরণ নরক সমান। এমন ভাবনা অন্নদাশঙ্করের। তাঁর মতে— ''জাতীয়তাবাদও একপ্রকার ধর্ম। বিশেষত যে দেশ স্বাধীন হতে চেষ্টা করছে সে দেশে। অথবা স্বাধীনতা রাখতে চেষ্টা করছে সে দেশে। তা যদি না হত কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধে যোগ দিত না, বিদ্রোহ করত। রুশ দেশেও জাতীয়তাবাদ এখনো সতেজ। যারা সাম্যবাদী তারা জাতীয়দাবাদীও। এক সঙ্গে একাধিক ধর্মে বিশ্বাস মানবচরিত্রের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এ দেশেও আমরা শাক্ত বৈষ্ণবের সমন্বয় দেখেছি। এমন কথাও শুনেছি যে, যাঁর নাম শ্যামা তাঁরই নাম শ্যাম। যার নাম অসি তারই নাম বাঁশি। আমরা জাতকে-জাত সমন্বয়বাদী। এক দিন এমন কথাও শুনব যে যাঁর নাম কৃষ্ট তাঁরই নাম খ্রিস্ট, যার নাম বাইবেল তারই নাম বেদ। বিনু কোনো দিন মনে প্রাণে জাতীয়তাবাদী হতে পারল না, সাম্যবাদীও না। বাদীদের সঙ্গে তার বিবাদ বেধে যায়। কিন্তু তারও একটা ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল, এখনো রয়েছে ধর্মের কাজ জীবনকে অখণ্ডতা দেওয়া। কেবল দৈনন্দিন জীবনকে নয়। সমগ্র জীবনকে। সমগ্র জীবন বলতে কি শুধু ইহকালের জীবন বোঝায়? পরকালের জীবন কি নেই? যদি থাকে তবে ইহপরকালব্যাপী অখণ্ড মণ্ডলাকার জীবন যার দ্বারা ধৃত হয়েছে তারই নাম ধর্ম। ধর্ম ব্যক্তিকে নিবিড় করে বেঁধেছে সমষ্টির সঙ্গে, কিন্তু বাঁধনটা বিধিনিষেধের নয়, স্বার্থের বা সুবিধার নয়, অবিভক্ত জীবনের। সেও একটি অখণ্ড বৃত্ত, আমরা তার এক একটি বিন্দু। ধর্মই বলো, প্রেমই বলো, তার সার হচ্ছে ঐক্যবোধ। মানুষে মানুষে ঐক্যবোধ, মানুষে পুশুতে পাখিতে বনস্পতিতে ঐক্যবোধ, প্রাণীতে বস্তুতে ঐক্যবোধ, বস্তুতে শক্তিতে ঐক্যবোধ, শক্তিতে সত্তায় ঐক্যবোধ। এ শৃঙ্খল কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে! শেষ একটা কথার কথা, যেমন আরম্ভ একটা কথার কথা। আদিও নেই, অন্তও নেই। বিনু অনুভব করে।''[৫৩]

প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই যে মৌলবাদ আছে, তা স্বীকার করলেন এক সাক্ষাৎকারে— বাংলাদেশের মির্জা ফাহমিদা আজিম সহলী প্রশ্ন কারেছিলেন। প্রাবন্ধিককে মৌলবাদ সম্পর্কে আপনার ধরনা কি? উত্তরে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন—''মৌলবাদ সব ধর্মে রয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান সব ধর্মে মৌলবাদ রয়েছে। এরা মধ্যযুগের মানুষ। যে কোনও ধর্মের মৌলবাদ প্রগতির অন্তরায়।''[৫৪]

তবে বদ্ধমূল ধারনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে যে রেনেসাঁস ও রিফরমেশন আসে এটা

অন্নদাশঙ্কর বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন— ''এই বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে রেনেসাঁস ও রেফরমেশন। মানুষ সন্ন্যাসীদের জীবনদর্শনের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে অনেক সময় ধর্মের বিরুদ্ধতা, ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধতা করে। আধুনিক যুগের সূচনা হয়। এ যুগ মানবিকতার যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ। দেড় হাজার বছরের সংস্কারবদ্ধতার হাত থেকে মুক্তির যুগ। মুক্তির সঙ্গে বাড়াবাড়ি খানিকটা থাকেই। মুক্তিকামীরা বাড়াবাড়ি করেছেন। সেই যে একটা কথা আছে স্নানের পর ময়লা জল ফেলে দিতে গিয়ে শিশুকেও ফেলে দেওয়া। তেমনি দেড় হাজার বছরের সংস্কারবদ্ধতাকে ফেলে দিতে গিয়ে ধর্মকেও ফেলে দেওয়া। ঈশ্বরবাদকেও ফেলে দেওয়া। আধুনিক মানস ধীরে ধীরে মুক্তির আনুষঙ্গিক বাড়াবাড়ির প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসীদের জীবনদর্শন সন্ন্যাসীরা মেনে চলতে পারেন, কিন্তু আর সবাইকে মেনে নিতে বললে বিদ্রোহ অনিবার্য। তবে সে বিদ্রোহ যেন ধর্মকেও সন্ন্যাসের সঙ্গে এক কোটায় না ফেলে।

আধুনিকপন্থীদের মনে রাখতে হবে যে মানুষের যেমন অর্থ চাই, কাম চাই, তেমনি ধর্ম চাই, ঈশ্বরবিশ্বাস চাই।''[৫৫]

অন্যদিকে প্রাবন্ধিক *আমার ধর্ম বিশ্বাস* নামক প্রবন্ধে যে কথা বলেন তা হল— ''কেমন করে সবজান্তার মতো ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার অভিমত ব্যক্ত করি? এই পর্যন্ত বলতে পারি, সব কিছুই এক এবং একই সব কিছু। সেই এককে সকলের মধ্যে দেখা ও সকলকে একের মধ্যে দেখা, এই হচ্ছে উপনিষদের নির্দেশ। আর এই হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত প্রত্যয়। আমি বিশ্বাস করি যে সেই এক আমার ভিতরেও আছেন, বাইরেও আছেন আর আমিও আছি তাঁর ভেতরে, কিন্তু তাঁর বাইরে নয়। এইটুকুই তাঁর সঙ্গে আমার প্রভেদ নতুবা তিনি আর আমি অভেদ। তাত্ত্বিক পরিভাষায় বলতে গেলে বলব আমি দ্বৈত্যদ্বৈতবাদী। সাধারণত লোকে মনে করে, যাঁরা নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী তাঁরা অধ্যাত্মবাদী হতে পারেন না, যেন ঈশ্বর বিশ্বাস ও অধ্যাত্মবাদ এক ও অভিন্ন, সেটা ঠিক নয়। তাই যদি হতো তবে বৌদ্ধ জৈনরাও অধ্যাত্মবাদী বলে গণ্য হতেন না। আইনস্টাইন যদিও ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না, তবু তিনিও প্রকৃত অর্থে অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। একথা অন্যান্য বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেও বলা যায়। মতবাদ যাই হোক না কেন, কার্যকলাপের থেকেই বোঝা যায় কে অধ্যাত্মবাদী কে নয়। যাঁরা মানবিকবাদী, ইতিহাসের ইচ্ছা যাঁরা পূরণ করেন তাঁদেরকেও আমি অধ্যাত্মবাদী বলে স্বীকার করি, যেমন লেনিনকে, যেমন মাও জে দংকে। কথা নয় কাজ, এর দ্বারাই প্রমাণ হয় অধ্যাত্মমার্গে কে কতদূর এগিয়ে। আধুনিক যুগে আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা আগের চেয়ে আরও উদার হওয়া উচিত, তা না হলে আইনস্টাইন, লেনিন প্রমুখ মানবিকবাদীদের বাদ দিতে হয়। আর তাঁদের জায়গায় নিয়ে আসতে হয় কতকগুলি অন্ধ অজ্ঞ মৌলবাদীকে।''[৫৬]

অন্য একটি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন— ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন ইতিহাসের প্রাচীন বা মধ্যযুগে তো নয়ই, ইংরেজ আমলেও নয়। এটা কংগ্রেস আমলেরই বিশেষত্ব। প্রাবন্ধিক আক্ষেপ করে বলেন— যে যার ধর্মকে রাজধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম করতে চাইলে দেশ ছ'চির হবে। স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। স্বাধীনতার জন্যে এতকালের তপস্যা ব্যর্থ হবে। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপারে আর সংস্কৃতি সমাজগত বন্ধনের ইমারত গড়ে। তাই প্রাবন্ধিক বলেন— ''অর্থাৎ যাঁর যে ধর্মে রুচি সে ধর্মে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি খ্রীস্টান না ইহুদী, খ্রীস্টান হয়ে থাকলে ক্যাথলিক না প্রোটেস্টান্ট, প্রোটেস্টান্ট হয়ে থাকলে লুথারপন্থী না ক্যালভিনপন্থী না কোয়েকার না মেথডিস্ট না অন্যান্য শাখার অন্তর্ভুক্ত কেউ তা জানেও না, জানতে চায়ও না।''[৫৭]

মোটকথা যে ধর্মেরই হোক প্রত্যেকেরই যে সমান গুরুত্বপূর্ণ— তার প্রমাণ মেলে প্রাবন্ধিকের সুরে— '' সুতরাং সেকুলার স্টেট হচ্ছে সেই ভিত্তি যা আমাদের রাষ্ট্রকে ধারণ করে আছে। যে ধারণ করে আছে তাকেও ধারণ করা অত্যাবশ্যক। এটা একজনের একটা খেয়াল নয় যে একে বিসর্জন দিলেও চলে। অথচ এরকম বিপরীত বুদ্ধি আমাদের দেশে অতি সুলভ। হিন্দুরাই যেন এদেশের মালিক, আর সকলে হিন্দুদের কৃপায় বাস করছে। প্রকৃত সত্য তা নয়। হিন্দুরাও আর সকলের কৃপায় বাস করছে। তারা যদি বিমুখ হয় তবে রাষ্ট্র ভেঙে যাবে, শিখরা প্রাণ দিয়ে লড়বে না, পার্শীরা সেনা পরিচালনা করবে না, অ্যাংলোইণ্ডিয়ানরা শত্রুবিমান ভূতলে নামাবে না, খ্রীস্টানরা নার্স হয়ে রণাঙ্গনে যাবে না। আর মুসলমানরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলে অর্থনীতি বিধ্বস্ত হবে। অর্থনীতির বিভিন্ন ধাপ তাদের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুর চেয়ে মুসলমান কম দরকারী নয়। এখানে মানুষ হিসেবে বিচার করতে হবে। টিকি দেখে বা দাড়ি দেখে নয়। ঘরে আগুন লাগলে যারা নিবিয়ে ফেলতে ছুটে আসে তারা কে কোন ধর্মের লোক কোন সমাজের লোক এটা মূর্খের গণনা। তেমনি শিল্পে বাণিজ্যে কৃষিতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যার কর্ম তারে সাজে। তাকে পরম সমাদরে তার স্বস্থানে নিযুক্ত রাখতে হবে। তাকে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া চলবে না। তাকে কথায় কথায় সন্দেহ করাও নির্বুদ্ধিতা। কোটি কোটি নাগরিককে সন্দেহ করলে মানুষ বিশ্বাস করবে কাকে? শেষকালে নিজের সম্প্রদায়কেও অবিশ্বাস করে বসবে।''[৫৮]

অন্নদাশঙ্করের সংস্কৃতি চিন্তায় শিক্ষা

প্রাবন্ধিকের মতে 'সবাইকে শিক্ষিত করা কর্তব্য'। আর সেটা হতে পারে বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত যে কোনো ভাষায়। শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষের ভেতরের গুণের বিকাশ ঘটে এবং ক্ষমতার সঠিক চর্চা ও উন্নয়ণ ঘটাতে পারে। আর এই শিক্ষাই মানুষ ও সমাজ সৃষ্টি করে। এসব ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ। তিনি সর্বভারতীয় মানসিকতার চর্চায় বিশ্বাসী বলেই বলতে পারেন— ''ইংরেজী

মাধ্যম বিদ্যালয়, বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়, মিশ্র ইংরেজী হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয় নানা রকম বিদ্যালয়েই আমি নিমন্ত্রিত হয়েছি। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তারা বাঙালী ভিন্ন আর কারো সঙ্গে মেলামেশা করে না। আর ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তারা বাঙালী, পাঞ্জাবী, দক্ষিণী, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি সারা ভারতের সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়। পরবর্তী বয়সে তারা যেখানেই যাক বন্ধু-বান্ধব সহপাঠী পায়।"[৫৯] ফলে তাদের বিশ্বচেতনা অঙ্কুরিত হয়। এছাড়া প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন আমরা সংস্কৃত শিখব ভাষাকে মার্জিত করার জন্যে নয়, প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের বহমানতা রক্ষা করার জন্য। প্রাবন্ধিক ইংরেজীকে স্বকালের সঙ্গে স্বদেশের যোগ সূত্র অক্ষুন্ন রাখার পক্ষপাতী। কারণ ইংরেজী এখন সারা দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের ভাব বিনিময়ের ভাষা।

মধ্যযুগে মুসলমান সুলতানদের আনুকূল্যে কীভাবে অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে *সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা* নামক প্রবন্ধে তা ফুটে উঠেছে। তাঁর মতে সংস্কৃতে অনুবাদ, বেদ ও কোরান ইংরেজীতে তর্জমা এবং তার থেকে আসে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় মূলের অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ। তিনি আরো বলেন, ভারতে যখন ইংরেজরা আসে তখন শিক্ষার হেরফের, সংস্কৃতির রূপান্তর নিয়ে মাথা না ঘামালেও তাঁরা খোলা মনের হিন্দু ও মুসলমানদের সাথে সরকারী জীবনের আড়ালে মিতালী পাতেন। ফলে রামমোহনের মতো অনেকেই পশ্চিমের সাথে পা মেলান, উন্নতি হয়, সাহিত্যের, শিক্ষার, সংস্কৃতির। আবার 'শিক্ষা নীতি প্রসঙ্গে' নামক প্রবন্ধে বলেন —''সংস্কৃত শিক্ষা যেমন প্রাচীন ভারতের বার্তা বহন করে আনে, ফার্সী শিক্ষা যেমন মধ্যযুগের তথা মধ্য প্রাচ্যের, তেমনি ইংরেজী বহন করে আনে আধুনিক ইউরোপ আমেরিকা তথা বহির্বিশ্বের।"[৬০] যুগ চেতনা ও বিশ্ব চেতনা যতই বাড়তে থাকে ততই শিক্ষা বিস্তার হতে থাকে ইংরেজী মারফৎ। কিন্তু তাঁর সংশয় অন্য এক প্রবন্ধে — ''আধুনিক শিক্ষা বিদেশ থেকে আমদানী করার সময় কিছু পরিমাণে মনুষ্যত্বও আমদানী করা হয়েছিল। সেটা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে এসেছে বলে ভয় হয়। নইলে ছাত্রদের এমন আস্পর্ধা হতো না যে তারা মাস্টারদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিত, অধ্যাপকদের তুইতোকারি করত।"[৬১] অন্যদিকে অন্নদাশঙ্কর রায় শিক্ষার সংকট নামক প্রবন্ধের ভূমিকাংশে বলেছেন— ''সব দেশের মানুষ যেটা মেনে নেবে সেটাই হবে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থা।"[৬২] এবং শেষ পর্যন্ত সেই গ্রন্থের ভূমিকাংশ অনুযায়ী— ''তিনি এখনো বিশ্বাস করেন যে, শতকরা সত্তর জন নিরক্ষর দেশবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে একভাষী সূত্রই একমাত্র সূত্র। মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বিভাষীও হতে পারে, ত্রিভাষীও হতে পারে। কিন্তু কাউকে বাধ্য করা উচিৎ নয়।"[৬৩]

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ধরন কেমন হবে, তা শিক্ষার সংকট নামক প্রবন্ধে

অল্প কথায় প্রাবন্ধিক বোঝালেন— ''উন্নত দেশগুলিতে যে প্যাটার্ন লক্ষিত হচ্ছে তা অল্প কথায় এই যে, স্কুলের শিক্ষা হবে সার্বজনীন ও বিনামূল্যে লভ্য। কলেজের শিক্ষা হবে অধিকাংশ ছাত্রের অধিগম্য, কিন্তু বিনামূল্যে নয়। হয় ঘরের টাকার নয় স্কলারশিপের টাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত কম ছাত্রের জন্যে। তাদের বেশীর ভাগই স্কলারশিপ পায়। ... স্কুলের শিক্ষা যদি কাঁচা থেকে যায় তবে সেইসব কাঁচা ছাত্রদের কলেজে ঢুকতে দেওয়াই ভুল। কিন্তু তারা যাবেই বা কোথায়! কলেজের যতগুলো বিকল্প অন্যান্য উন্নত দেশে দেখা যায় এদেশে ততগুলো নয়। আর দেখা গেলেই বা কী? যারা কলেজের পক্ষে কাঁচা তারা তার বিকল্পগুলির পক্ষেও অনেক সময় কাঁচা।''[৬৪]

শেষ পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-স্বরূপটাও প্রাবন্ধিক তুলে ধরলেন এইভাবে— ''ছাত্রদের এতকাল নিষ্ঠুরভাবে পেটানো হয়েছে, এবার তাদের হাতে পিটুনি খেতে হচ্ছে। ইতিহাসের পরিহাস। এখন প্রহসনটার ষোলকলা পূর্ণ হয় যদি পুলিশকে এর মধ্যে টেনে আনা হয়। অবশ্য না ডাকলেও আসতে বাধ্য তারা। কোথাও অপরাধ অনুষ্ঠিত হলেই পুলিশকে সেখানে যেতে হয় ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এটা মধ্যযুগও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও গির্জা বা মন্দির নয়। তা হলেও আমি দুঃখিত।''[৬৫]

প্রাবন্ধিক যুগোচিত শিক্ষায় বিশ্বাসী। সেই শিক্ষা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে। বেতালা হলেই তাকে বাতিল করতে হবে, তা সে সংস্কৃতিভিত্তিকই হোক আর মাতৃভাষাভিত্তিকই হোক। প্রাবন্ধিক মনে করেন সব দেশেই শিক্ষা বিবর্তনশীল। তবে যুগোচিত— ''সব দেশে শিক্ষাব্যবস্থা বিবর্তনশীল। কোথাও বৈপ্লবিক নয়। ছাত্রদের হাতে বিপ্লবের ভার কেউ দেয় না। এমন কি রুশ চীনও না। ছেলেরা আগে পড়াশুনা করবে, তারপরে কাজকর্ম করবে, কেউ কেউ রাজনীতিতে যোগ দেবে। সে রাজনীতি কোন কোন দেশে বৈপ্লবিক। আমাদের এদেশে আধা-বৈপ্লবিক। কিন্তু পুড়াশুনা ছেড়ে কাজকর্ম ছেড়ে কেবলমাত্র বৈপ্লবিক রাজনীতি নিয়ে থাকা কোথাও কখনো লক্ষ লক্ষ ছাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। ইতিহাসে আর কোথাও এর নজীর নেই।''[৬৬]

আবার *আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা* নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক অন্যান্য দেশের সাথে ভারতীয় শিক্ষা কিংবা, প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় শিক্ষার বিবর্তন ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষার কোন স্তরে রূপান্তরিত হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত জানান। তিনি মনে করেন— ''সেকালে হিন্দুর ছেলেরা যেত পাঠশালায়, তার পরে তাদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য তারা যেত চতুষ্পাঠীতে বা টোলে। আর মুসলমানের ছেলেরা যেত মক্তবে, তার পরে মাদ্রাসায়। মুসলমানদের মক্তব ও মাদ্রাসার দুয়ার হিন্দুর ছেলেদের জন্যে খোলা থাকত। তারা আরবী ফারসী শিখে সরকারী চাকরির শরিক হতো। এইরূপ উদারতা হিন্দু শিক্ষায়তনগুলির ছিল না, মসুলমানদের প্রতি উদার হওয়া দূরে থাক হিন্দু সমাজের তথাকথিত

নিম্নবর্ণের উপর তারা উদার হয়নি। পাঠশালা অবধিই ছিল তথাকথিত নিম্নবর্ণের দৌড়।

মুসলমানরা উদার হলেও তাদের মাদ্রাসা ও মক্তবগুলিতে যা শেখানো হতো তা টোলে চতুষ্পাঠীগুলির মতোই সেকেলে। নতুন বিদ্যা, নতুন জ্ঞান, নতুন চিন্তা, নতুন বিচার তাদের কাছে তেমনি বর্জনীয় ছিল যেমন হিন্দুদের কাছে। শিক্ষার সুযোগ যারা পেতো তারা মধ্যযুগেই নিঃশ্বাস নিত, আধুনিক যুগে নয়। অথচ আধুনিক যুগ ইউরোপে আরম্ভ হয়ে যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই। তার মানে চার শতাব্দীকাল ভারতের টোল চতুষ্পাঠী মাদ্রাসা ইমামবাড়া মধ্যযুগেরই মানসলোকে অবস্থান করেছিল।

পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু টোল চতুষ্পাঠী মাদ্রাসা ইমামবাড়াকে আধুনিক শিক্ষার আয়তনে পরিণত করা কারো সাধ্য ছিল না। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষার আয়তন হিসাবে পাশ্চাত্য আদর্শের স্কুল কলেজ প্রবর্তন করাই শ্রেয় বিবেচিত হয়। যার ইচ্ছা সে প্রাচীন আদর্শের শিক্ষায়তনে যাক, যার ইচ্ছা সে আধুনিক আদর্শের শিক্ষায়তনে যাক। এই মনোভাব পরে সরকারী নীতিতেও প্রতিফলিত হয়। সরকার প্রাচীনপন্থীদের জন্যে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কলকাতার হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সরকার নন। বেসরকারী ভারতীয় ও ইউরোপীয়রা। সরকারের শিক্ষানীতি পাশ্চাত্ত্য আদর্শের দিকে মোড় নিতে আরো সময় লাগে।”[৬৭]

ভারতে যখন পাশ্চাত্য আদর্শে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ঊনবিংশ শতাব্দী তার মধ্যে গগণে। এই শতাব্দী শিক্ষাকে যে ধর্মের আঁচলমুক্ত করে দর্শন বিজ্ঞানের সাথে একসূত্রে গেঁথে যায়— সে কথায় বিশ্বাসী—প্রাবন্ধিক। তিনি সরাসরি বলেই দিচ্ছেন— ‘‘আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দুনিয়ার সব দেশেই। তা সত্ত্বেও যারা বাইরে থেকে যাচ্ছে তাদের জন্যে রেডিও টেলিভিশন বা করেসপণ্ডেন্স কোর্স প্রবর্তিত হচ্ছে। বাড়ী বসেই উচ্চশিক্ষা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। যারা ডিগ্রী চায় তারা পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রীও পাচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমরা শুধু ডিগ্রীর জন্যে যাইনে। যাই বড়ো বড়ো অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসে তাঁদের দীপশিখা থেকে আমাদের দীপগুলি জ্বালিয়ে নিতে। যাই সমবয়সীদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের কাছ থেকেও কিছু শিখতে ও তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করে নিতে। যে ক’টি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটাই সে ক’টি বছর জীবনের স্মরণীয় সময়। জীবিকার জন্যে একটা ছাপ চাই, এটা সত্য। কিন্তু আরো বড়ো সত্য, জীবনের জন্যেও একপ্রকার প্রস্তুতি চাই যা বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন আর কোথাও হয় না। একদিন হয়তো জীবিকার জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা হবে, যেমন কারিগরি শিক্ষায়তন। সেইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে চাপ কমবে। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের আকর্ষণ কমবে না। জীবনের সিংহদ্বার হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়।”[৬৮]

আর পরীক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, সেটা প্রাচীন যুগেও ছিল। এখনও আছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন ক্ষত্রিয়দের জন্যে ছিল অস্ত্রপরীক্ষা। ব্রাহ্মণদের নানাভাবে গুরুর মনস্তুষ্টি বিধান ইত্যাদি। তাই তিনি বলেন— ''পরীক্ষা বলে এই যে আপদটি এটি মানব ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত নতুন। তবে একেবারে অজানা নয়। ক্ষত্রিয়দের জন্যে ছিল অস্ত্রপরীক্ষা। ব্রাহ্মণদের নানা ভাবে গুরুর মনস্তুষ্টি বিধান করতে হতো। মহাভারতে সে সব উপাখ্যান আছে। কারিগর শ্রেণীরাও শিক্ষানবীশী করে হাতের কাজের পরীক্ষা দিত। এবেবারে আনাড়ি কেউ নয়, চাষীদের ঘরের ছেলেরাও নয়। কিন্তু ইদানীং একটা ধুয়ো উঠেছে যে পরীক্ষা বলে একটা আপদ আদৌ থাকবে না, থাকলে সেটা হবে নামেমাত্র পরীক্ষা। তাও একজন আধজনের ক্ষেত্রে নয়, শত সহস্র বিদ্যার্থীর ক্ষেত্রে। এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা না হলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে। যারা তৃতীয় বিভাগেও পাশ করার যোগ্য নয় তাদের জন্যে কলেজের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যারা পাশ করার কোর্সের গ্রাজুয়েট হবারও অযোগ্য তাদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সেখান থেকে একটা ছাপ নিয়ে বেরিয়েই বা তারা করবে কী? কর্মক্ষেত্রে তাদের ক'জনেরই বা সুবিধা হবে? মাঝখান থেকে ডিগ্রীর কদর কমে যাবে। সত্যিকার বিদ্বান যারা তাদের বাজারদর নেমে যাবে।''[৬৯]

এইকালে এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে যে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে যে কোনো বিদ্যার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে উপবীত গ্রহণ করতে পারে। যদি পরীক্ষায় সফল হয়। তবে শিক্ষার মাধ্যম কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে প্রাবন্ধিক সজাগ— ''শিক্ষা হবে যুগোচিত। সে চলবে যুগের সঙ্গে তাল রেখে। বেতালা হলেই তাকে বাতিল করতে হবে, তা সে সংস্কৃতিভিত্তিকই হোক আর মাতৃভাষাভিত্তিকই হোক। ইংরেজীকে কেউ চিরন্তন মনে করে না, কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে হাতের কাছে ও ছাড়া আর কোনো ভাষাকে পাচ্ছে না বলেই ইংরেজীকে আঁকড়ে ধরছে। ইংরেজীর ভিতর দিয়ে নিজের যুগকে পাওয়া যায়। ইংরেজীর মতো বাংলা যেদিন এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তার ভাণ্ডার হবে সেদিন বাংলাই হবে উচ্চতম শিক্ষার বাহন। ইংরেজীর থেকে তর্জমা করে বা তার অনুসরণে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করলে মননের প্রমাণ পাওয়া যাবে না। মনীষার পরিচয় দেওয়া হবে না। বিদ্যার্থীদের দীপগুলিকে জ্বালিয়ে দিতে হলে নিজেদের দীপগুলিকেও জ্বালিয়ে রাখতে হবে। অধ্যাপকদেরই অধ্যয়ন করতে হবে তার আগে। এদেশে ইংরেজী ভিন্ন আর কোন্ বাহন আছে যাতে অধিকতর ও অভিনব অধ্যয়ন সম্ভব?''[৭০] শেষ পর্যন্ত প্রাবন্ধিকের মন্তব্য—

''আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো আধুনিক, আরো আন্তর্জাতিক, আরো মানবিক করতে হবে। যারা স্বাদেশিকতার অনুরাগী তাঁরা টোল চতুষ্পাঠীর পুনরুজ্জীবন বিবেচনা করে দেখতে

পারেন। আর যাঁরা বুর্জোয়ার ছোঁওয়া এড়াতে চান তাঁরা আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দেখতে পারেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ডালপালা ছাঁটতে চাইলে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মূলোচ্ছেদ করতে গেলে আমার আপত্তি আছে। কারণ এটা বিদেশ থেকে অনীত হলেও বিষবৃক্ষ নয়। মধ্যবিত্তরা এর ফল পেড়ে খাচ্ছে বলে সে ফল আঙুরের মতো টক নয়।"[৭১]

অন্যদিকে *শিক্ষা প্রসঙ্গে* নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের সুর একটু আলাদা। তিনি বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশ্বাসী। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর সেই সময়ে যে কথা বলেছিলেন, সে কথা আজও কিছুটা হলেও সত্য— ''বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যেমন মাথাভারী হয়ে উঠছে তাতে এর সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হওয়া সম্ভব নয়। আমিও চিন্তাকুল। কিন্তু সেই যে একটা কথা আছে, ''হাতীঘোড়া গেল তল মশা বলে কতজল?" শিক্ষাজগতে আমি একটি মশা। আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমি সজাগ। তাই মূল সমস্যায় সাধারণত কণ্ঠক্ষেপ করিনে। শাখা সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে দুটি একটি কথা বলি। যদি তার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক থাকে।

আমি সংস্কৃতির রাজ্যের লোক। আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি হচ্ছে একপ্রকার গঙ্গাসাগর সঙ্গম। এতে যেমন স্বদেশের গঙ্গা আছে তেমনি আছে স্বকালের সাগর, যে সাগর সারা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অবধি প্রসারিত। গঙ্গাই শুধু থাকবে, সাগরকে বর্জন করতে হবে, এ প্রস্তাবে আমি কোনোদিন রাজী হইনি, কোনোদিন হব না। কারণ এতে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির ক্ষতি করবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমুদ্রযাত্রা বারণ করেছিলেন, পাছে আমাদের জাত যায়। সেই আত্মঘাতী ব্যবস্থা যদি আজ অবধি বলবৎ থাকত তাহলে হয়তো আমাদের জাত থাকত, কিন্তু আমরা জাতি হতে পারতুম না, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতুম না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কল্‌কে পেতুম না। সেই আত্মঘাতী ব্যবস্থাকে খিড়কির দরজা দিয়ে আবার ঘরে নিয়ে আসছেন যাঁরা তাঁরা কি জানেন সংস্কৃতির উপর এর প্রতিক্রিয়া কী হবে? তেমন এক কূপমণ্ডুক সংস্কৃতি নিয়ে কোথায় আমরা দাঁড়াব? অষ্টাদশ শতাব্দীতে?"[৭২]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভক্তীকরণের স্বপক্ষে অন্নদাশঙ্কর রায় যে মন্তব্য করেছেন— ''আমার নিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয় হবে দুটি। একটির বাহন ইংরেজী। প্রেসিডেন্সী কলেজ তথা তারই মতো আরো কয়েকটি কলেজ হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল। অপরটির বাহন বাংলা। অবশিষ্ট কলেজগুলি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল। কোন কলেজ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল হবে সেটা স্থির করবে সেই কলেজের ছাত্ররা। তাদের ভোট নেওয়া হবে। যারা বাংলা চায় তারা একদিকে। যারা ইংরেজী চায় তারা অন্যদিকে। ভোটে যারা হেরে যাবে তারা কলেজ পরিবর্তন করতে পারবে। প্রেসিডেন্সি কলেজ যদি ইংরেজী বাহনের পক্ষে ভোট দেয় তবে বাংলার পক্ষপাতীরা ট্রান্সফার

সার্টিফিকেট নিয়ে অন্যান্য কলেজে ভর্তি হবে। তেমনি বিদ্যাসাগর কলেজ যদি বাংলার পক্ষে ভোট দেয় তবে ইংরেজীর পক্ষপাতীরা প্রেসিডেন্সিতে বা তার মতো ইংরেজী মাধ্যম কলেজে স্থানান্তর চাইবে।

একবার এই ভাগাভাগির পালা শেষ হলে দুই বিশ্ববিদ্যালয় যে যার রুচি অনুসারে নিয়মকানুন প্রবর্তন বা পরিবর্তন করবে। ছাত্ররা সেটা মেনে নেবে। পুরাতন ঐতিহ্য কারো পক্ষে বলবৎ হবে না। নতুন করে আরম্ভ করার সুযোগ উভয়েই পাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নামটাও ভাগ হয়ে যেতে পারে। কলকাতা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন প্রাগ নগরে চেক বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়। হিন্দির জন্যে তৃতীয় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করা যেতে পারে।”[৭৩]

প্রাবন্ধিক বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বজ্ঞান বিতরণের তথা অর্জনের জন্য। কিন্তু সেটা সকলের জন্য নয়, কেননা, তাহলে সমস্যা আছে। সমস্যাটা হল বেকার সংখ্যা বাড়ানো। তিনি পরীক্ষা প্রসঙ্গে নামক প্রবন্ধে খুব সুন্দর করে বোঝালেন যে পরীক্ষা নামক প্রথাটি একেবারে তুলে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ— ‘‘বিনা পরীক্ষার প্রাথমিক শিক্ষা চলতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষাও চালাতে চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু বিনা পরীক্ষায় কলেজের শিক্ষা কোনো দেশেই চলতি হয়নি, হয়ে থাকলে আমার জানা নেই। সংখ্যা যদি নির্দিষ্ট হয় তবে পরীক্ষা ছাড়া উপায় নেই। সেকেণ্ডারি বোর্ড যদি পরীক্ষা না করে প্রত্যেকটি কলেজ নিজের মতো করে পরীক্ষা করে নেবে। সে পরীক্ষায় সবাই পাশ করবে না, কলেজে যতগুলি সীট ততগুলি পাশ করবে। তেমনি প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের মতো করলে সে পরীক্ষাতেও সবাই পাশ করবে না। নয়তো চাকরিক্ষেত্রে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে দেওয়া মানেই বেকার সংখ্যা বাড়তে দেওয়া। সমাজ যেদিন সবাইকে চাকরি বা স্বাধীন জীবিকা জোগাতে পারবে সেদিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আপনা থেকেই বাড়বে। আপাত অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। পরীক্ষা নামক প্রথাটি একেবারে তুলে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।”[৭৪]

প্রাবন্ধিক শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক— এই ত্রয়ীর সুষ্ঠু সমন্বয় আশা করেন। না হলে সংস্কৃতিও ভেঙে পড়বে। পারস্পরিক বিচার বিশ্লেষণের ফলেই যে একটি উন্নততর ব্যবস্থার বিবর্তন হতে পারে এটা অন্নদাশঙ্কর রায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর ভাষায়— ‘‘শিক্ষকদের জানা উচিত যে শিক্ষার সঙ্গে আরো দশটা প্রশ্নও গভীরভাবে জড়িত। যে দেশের লোক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অহিংস উপায় জানে সে দেশের পুলিশ ও সৈন্য ব্যবস্থা এত বেশী ব্যয়সাপেক্ষ হয় না কাজেই শিক্ষার খাতে

যথেষ্ট টাকা খরচ করতে পারা যায়। তার জন্যে যত্র তত্র মদের দোকান খুলতে হয় না। নাবালকদেরও মদ খেতে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। অহিংসা একটা পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। ব্যবহারিক জগতে এর আবশ্যকতা আছে বলেই আমি অহিংসায় বিশ্বাসী। দেশের লোক যতই এর থেকে সরে যাচ্ছে ততই আমাদের সমস্যাগুলো জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এর পরে হয়তো দেখা যাবে যে ছাত্ররাই শিক্ষকদের শিক্ষক হয় বসেছে ও বেতনদানের বদলে বেত্রদান করছে। তখন প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে থানা বসাতে হবে।"[৭৫]

আমাদের জীবনে লোকশিক্ষার প্রয়োজন কতটা তা জানালেন প্রাবন্ধিক একটি প্রবন্ধে— "শিক্ষা মানেই অক্ষরপরিচয়, অক্ষরপরিচয় মানেই শিক্ষা। আসলে তা নয়। শুনেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বেদ কখনো লিপিবদ্ধ হয়নি। স্যার উইলিয়াম জোন্‌স উদ্যোগী না হলে লিপিবদ্ধ হতো না। চিরকাল মুখেই সংরক্ষিত হয়ে এসেছিল, মুখে মুখেই সংরক্ষিত হতো। তবে কি বলতে হবে যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা ছিলেন অশিক্ষিত? একজন মানুষ চক্ষুর মাধ্যমে শেখে, একজন শেখে কর্ণের মাধ্যমে। দুটোই শিক্ষা। ছাপাখানা যখন ছিল না, খুব কম লোকই বই পড়ে শিখত, বেশীর ভাগই শিখত যাত্রা দেখে, কথকতা শুনে। আকবর, শিবাজী, রণজিৎ সিংহেরও অস্ত্রশিক্ষা হয়েছিল। শাস্ত্রশিক্ষার মতো অস্ত্রশিক্ষাও একপ্রকার শিক্ষা। কৃষক শ্রমিক কারিগর যে যার বৃত্তি শিখত গুরুজনের কাছে, গুরুর কাছে। ব্যবসায়ীরা দোকানে বসে হাতে কলমে শিখত। শিক্ষানবীশীও শিক্ষা।"[৭৬]

এছাড়াও যাত্রা কথকতা রেডিও সিনেমার সাহায্যে সবাইকে মোটামুটি শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যদিও সবাই ইনটেলেকচুয়াল বলে বিদিত হবে না। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের মতো মোটা শিক্ষা সকলের ভাগেই জুটুক এটা বিশ্বাস করতেন প্রাবন্ধিক। অপর দিকে শিক্ষার ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক শিক্ষার অবস্থা ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সে সম্পর্কে বলেছেন। বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দি কোনটির গুরুত্ব কেমন, কার ভবিষ্যৎ কেমন— সে সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য হল—

"আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানকে কি বাংলার মাধ্যমে পরিবেশন করা যায় না? যায় বইকি। যে ভাষা বারো কোটি বাংলাভাষীর ভাষা তাতে কী না করা যায়? কিন্তু এপারের বই ওপারে বিকোবে না, ওপারের বই এপারে বিকোবে না। বিজ্ঞানের বই একসঙ্গে একলক্ষ কপি না ছাপলে মেহনৎ পোষাবে না। বছর বছর সংস্করণ না ছাপলে এক বছরের বই আরেক বছর পুরোনো হয়ে যাবে। এ তোমার কাব্য নাটক নয় যে দু'হাজার বছরেও চিরন্তন। এ হলো বিজ্ঞান। যার অসংখ্য শাখা। এ হলো অর্থনীতি। যার অসংখ্য প্রয়োগ। এ হলো রাজনীতি। যা বহুরুপীর মতো নিত্য রং বদলায়। আমি প্রতিদিন তিনখানা ইংরেজী সংবাদপত্র পড়ি। তিনখানা বাংলা সংবাদপত্র। ইংরেজীতে যা পাই বাংলায় তার চেয়ে অনেক কম, যদিও দাম সমান। একটু কষ্ট করে ইংরেজীটা ভালো করে শিখলে

একই খরচে বা আরো কম খরচে বহুবিদ্য হওয়া যায়। সেইজন্যে ইংরেজীটাই এত লোক এত যত্ন করে পড়ে।"[৭৭] শুধু হিন্দির প্রেমিকদের দলে প্রাবন্ধিক থাকলেও হিন্দির অসুবিধাটাও তুলে ধরেছেন। এইভাবে— ''আমি হিন্দী প্রেমিকদের দলেই ছিলুম, কিন্তু হিন্দীকে তো বাংলাদেশ একেবারেই বরদাস্ত করবে না, যেমন উর্দুকে বরদাস্ত করেনি। বাঙালীতে বাঙালীতে চিরবিচ্ছেদ ঘটে যাবে। তাই বাংলার উপরে আরো বেশী জোর দিতে চাই। কিন্তু জোর দিয়ে হবে কি? ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগসূত্র তো বাংলা নয়, হিন্দী। কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগসূত্র হিন্দী। সব দিক বিবেচনা করে আমি ইংরেজীকে হটাতে চাইনে। কেউ বলবেন বুর্জোয়া। বলুন। কিন্তু ইংরেজীওয়ালারাও তো সারা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ।"[৭৮]

ইংরেজীকে স্বকালের সঙ্গে স্বদেশের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী প্রাবন্ধিক। প্রাবন্ধিক মনে করেন, ইংরেজীকেও ঐচ্ছিক করতে হবে— অবশ্য যারা চাইবে তাদের জন্য। শেষ পর্যন্ত প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেন— ''দেশে যদি আধুনিকতার প্রয়োজন থাকে তবে ইংরেজীরও প্রয়োজন হবে। সাময়িকভাবে নয়, পাকাপাকিভাবে।"[৭৯]

অন্নদাশঙ্করের সংস্কৃতি চিন্তায় শিল্প

প্রত্যেক প্রকার শিল্পের এক একটি প্রধান অবলম্বন আছে। সেই অবলম্বনকে বাদ দিয়ে শিল্প হয় না। যেমন নৃত্যের গতি ও ছন্দ; গীতের সুর, চিত্রের বর্ণরেখা, ভাস্কর্যের আকৃতি, সাহিত্যের ভাষা। কিন্তু এসবের আবেদন কি মানুষের বোধ, বুদ্ধি ও বোধের ক্ষেত্রে নয়? অবশ্যই। শিল্পের আসল ধর্ম সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টি করা আর বোধকে জাগ্রত করা। সৌন্দর্য ও আনন্দ শিল্পীর শিল্পেরই আনুষঙ্গিক ফল। অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতে, শিল্প সৃষ্টি যদি শিল্প সম্মত হয় তাহলেই তিনি কৃতার্থ। শিল্পীর শিল্পে কেবল সুন্দরের সাধনা নয়, সেই সঙ্গে থাকে সত্যের চেতনা। নদীর ঢেউ এ জলের সঙ্গে থাকে গতি, গতি থাকে বলে নদীর জল কখনও পুরাতন হয় না। গতির চিরন্তনতাই তার সত্য, গতির ধারাই তার সৌন্দর্য। প্রাবন্ধিকের মতে — শিল্পীর স্বাধীনতা আসলে সমস্ত শিল্পির স্বাধীনতা। যারা নতুন কিছু বলতে চান সেই সব লেখক। স্বজাতি, স্বধর্ম ও স্ব-সমাজ সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজেদের মত ব্যক্ত করেন। কেউবা একটু এগিয়ে যাবতীয় মানবিক ব্যাপারে কণ্ঠক্ষেপ করেন। ফলে রাষ্ট্রের সাথে বিবাদ বেঁধে যায়। শিল্পী চেষ্টা করেন সৃষ্টিকে রক্ষা করতে। গর্ভিনীর কাজ যেমন গর্ভ রক্ষা করা, শিল্পির কাজ তেমনি শিল্প রক্ষা করা। আসলে প্রাবন্ধিক শেষ পর্যন্ত এটাই বলতে চেয়েছেন যে, শিল্পীর শেষ বিচার হবে তাঁর সৃষ্টি কর্মের দ্বারা, তিনি যেটা করেননি বা করতে পারেননি, সেটার দ্বারা নয়। প্রাবন্ধিকের 'আর্ট' নামক গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে এর উত্তর মেলে। কী সাহিত্যে কী ললিত কলায় আর্ট হচ্ছে রসাত্মক রূপ বা রূপাত্মক রস। রস থেকে রূপে পৌঁছতে হলে কল্পনাকে

করতে হয় পথ প্রদর্শিকা তারা। কল্পনা সত্যের অভাব নয়, সত্যের একত্ব বিধায়ক। মোট কথা অনুভূতি ও কল্পনা নিয়েই আর্টের আপনার সংসার। শুধু আর্টের প্রকৃতি নয় উদ্দেশ্য সম্পর্কেও প্রাবন্ধিকের মন্তব্য বেশ জোরালো— ''আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে লীলা।'' *অন্তঃসার* (১৯৫৪) ও *অন্তঃসৌন্দর্য* (১৯৬৫) প্রবন্ধ দুটি যুগল বৃন্তে বাঁধলেও ভুল হয় না। আর্টের অন্তঃসার জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যে ' জীবনের অন্তর সৌন্দর্যে। এভাবেই প্রাবন্ধিক জীবন, ধর্ম, শিল্প সব কিছুকে এক সাথে গেঁথে এক পরম নান্দনিক সমীকরণে পৌঁছে যান। আসলে কথার সমাপ্তিতেই সুরের সূচনা। photography র যেখানে শেষ শিল্পের শুরু সেখান থেকেই। নক্সার উপরেই সাহিত্যের স্থিতি, তেমনি যেখানে স্থূল জৈব প্রয়োজন শেষ, সেখান থেকেই সংস্কৃতির সূচনা।

অন্নদাশঙ্করের সংস্কৃতি চিন্তায় সমাজ ও অর্থনীতি

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় সাম্যবাদে বিশ্বাসী। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনগণের দারিদ্র্য মোচন। সমাজের এক দিকে সম্পদের পাহাড় অপরদিকে দারিদ্রের করাল গ্রাস। তাই তিনি উপলব্ধি করেছেন খাদ্য, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উপযুক্ত সময়ে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, বিশ্বাসী মনের শুচিতায়। তিনি দেখেছেন একুশ শতকে সত্যবাদী মানুষেরা অপাংক্তেয়। যাদের হাতে ধন আছে তারাই মালিক। কিন্তু এ স্রোতে কি গা ভাসানো ঠিক? এসময়ে প্রয়োজন— নিজের কাজে উৎকর্ষ সাধন করা, মৌলিক ভাবনা চিন্তা বজায় রাখা। মুছে বা হারিয়ে না যাওয়া। দুর্যোগের মধ্যেও প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা, আগলে রাখা, এটাই এখন মস্ত বড় দায়িত্ব। পাশাপাশি প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, আমাদের মৌলিক সম্পদ গ্রামীণ সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে তিনি এর একটা সীমা টানতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, যা কিছু প্রাচীন ঐতিহ্য, মৌলিক শাশ্বত — সেগুলিকে হারালে চলবে না।

মানবাধিকার দাবী প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেন— ''সদ্যগঠিত রাষ্ট্র সংঘ ১৯৪৮-এর ১০ই ডিসেম্বর বিশ্বমানবাধিকার সনদ ঘোষণা করেছিল, আশা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নৃশংসতার গ্লানি ও ভয় থেকে মুক্ত নূতন পৃথিবী গড়ে তোলা যাবে। এই ঘোষণায় সম্মতি দিয়েছিল সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র। সবার মনেই প্রবল আশা উদ্দীপনা ছিল শান্তির জন্য, মানুষের উন্নতি ও বিকাশের জন্য। পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল মানবাধিকার ঘোষণার। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের সংবিধানেও মানবাধিকারের মূলনীতি সঙ্কল্পের ভাষায় গৃহীত হয়েছে, ১৯৫০ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি। তারও পঞ্চাশ বছর হতে চলেছে।''[৮০] কিন্তু নানান সমস্যা জাতির মঙ্গলের অন্তরায় হয়েছে আজও তাই প্রাবন্ধিক মনে করেন— ''সব মানুষকে প্রথমে দিতে হবে অন্ন, তারপর জ্ঞান। প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে চীনের মহানায়ক কন্‌ফুসিয়াস এই দুটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যা অপরিহার্য। প্রথমে দেহের খোরাক পরে

মনের খোরাক।”[৮১]

মানবাধিকারের কথাগুলো নতুন নয়, খ্রিষ্ট ও ইসলাম ধর্মেও মানবাধিকারের কথা আছে। কিন্তু মানব বলতে বোঝায় পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ নয়। মেয়েদের সমানাধিকার দিতে দীর্ঘকাল কেটে গেছে। তবে ভারত এদিক থেকে অনেক দেশের তুলনায় অগ্রসর, কিন্তু পুরোপুরি নয়, তাই প্রাবন্ধিক শেষ পর্যন্ত বললেন— আমাদের কাজ হবে নারীকেও পুরুষের মতো মানুষ বলে স্বীকার করা এবং সর্বোতভাবে সমান বলে মেনে নেওয়া। প্রাবন্ধিক আবার বিশ্বমানবাধিকার নামক প্রবন্ধেও জানাচ্ছেন সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সার্বজনিক মানবাধিকারের একটি সর্বসম্মত ঘোষণা পত্র রাষ্ট্র সংঘ থেকে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৪৮-এর ১০ই ডিসেম্বর। কেননা, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, বিশেষ করে পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণে জাপানের বুকে ধ্বংসকাণ্ড দেখে মানুষের মনে যে ভয় ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। রাষ্ট্র সংঘের এই ঘোষণার উদ্দেশ্যে। ছিল ভয় ও আতঙ্ক থেকে মানুষকে মুক্ত করা। প্রাবন্ধিকের মতে— ‘‘স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও এসব মূলনীতি গৃহীত হয়েছে। বরং বলা যায়, ভারতের সর্বসাধারণ দেশবাসী নিজেরাই সঙ্কল্পবদ্ধ যাতে তাদের কতগুলো মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করা যায়। যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তিনটি ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার, তাছাড়া ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচারণ, চিন্তা ও মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা এবং তৃতীয়ত সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ-সুবিধার সমানাধিকার। আমাদের সংবিধানের মুখবন্ধেই রয়েছে এসব ঘোষণা।

আমরা আশা করেছিলাম ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলো জনসাধারণের জন্য ঘোষিত মৌলিক অধিকার যথাযথভাবে পালন ও পূরণ করবে। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছর আমরা যা দেখে এসেছি তা যথেষ্ট নয়।

দু’হাজার বছর পূর্বে চীন দেশের মহানায়ক কনফুসিয়াস নির্দেশ দিয়েছিলেন, সব মানুষকেই প্রথমে দিতে হবে অন্ন তারপর জ্ঞান বা শিক্ষা এই দুটি নির্দেশ অপরিহার্য। প্রথমে দেহের খোরাক পরে মনের ঘোরাক। এ দুটি কাজ প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য; শুধু চীনদেশে নয়। আজকাল এ দুটি অত্যাবশ্যক উপকরণ যে প্রতিটি মানুষকেই যোগাতে হয়। এটা মোটামুটি সর্বস্বীকৃত, যদিও এখন পর্যন্ত সেটা কার্যে পরিণত করা যায়নি। কিন্তু মতপার্থক্য ঘটছে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার নিয়ে। যেসব দেশ গণতান্ত্রিক নয় সেখানে রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কুচিত। আর যেসব দেশ এখন পর্যন্ত মধ্যযুগে পড়ে রয়েছে সেসব দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘিত। শুধুমাত্র রাষ্ট্রসংঘ থেকে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। তার জন্য চাই সর্বত্র প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রবর্তন, সর্বত্র ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা।”[৮২]

উপরিউক্ত অলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের সংস্কৃতি চিন্তায় একাধিক

ধারার মিশ্রণ ঘটেছে। ঘটাই স্বাভাবিক। কারণ তাঁর ''সাহিত্য চেতনা দুই আবাল্য মহান সাহিত্য প্রবাহে লালিত, একটি ভারতীয় সাহিত্যের তিন হাজার বছরের ধারা, অন্যটি য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের পাঁচশো বছরের জোয়ার।''[৮৩] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, শিল্প ও জীবন, বিশ্বাস ও মনের পাশাপাশি ভাবের সঙ্গে ভাবনা, বস্তু জিজ্ঞাসার সাথে রোমান্টিক চেতনা, লোকজীবনের সঙ্গে পরিশিলিত জীবন, সব কিছু মিলে তাঁর শিল্প চেতনার জন্ম এবং নান্দনিক সমীকরণে পৌঁছবার প্রয়াস। ফলে কোথায় কখন, কী ভাবে জাতির গঠন, উত্থান-পতন, সংস্কার হয়েছে তার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাও হয়ে উঠে বৈজ্ঞানিক। প্রাবন্ধিকের স্বপ্ন ভারত যেন হয়ে মহামানবের দেশ। যেখানে একই ছাতার তলায় হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, হুন সকলে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়বে। কারণ তিনি মুক্ত লেখক, বিরোধে নয়, মিলনে বিশ্বাসী। অন্ধকারের মাঝে আলোর দিশারী। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রার্থনা আমাদের সংস্কৃতিতে পাঁচ জন শিক্ষিত ভদ্রলোক নয়, তাতে লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ যেমন থাকবে তেমনি পাঠক, লেখক, সমঝদার, পৃষ্ঠপোষক। তবে কোথায় যেন প্রশ্ন থেকেই যায় যে, প্রাবন্ধিকের এই সংস্কৃতি চিন্তা ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন নয়তো? মনে হয় না। সংস্কৃতির স্বপ্নই তাকে ঘুমোতে দেয়নি।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সংস্কৃতি চিন্তায় থেকে যায় মননভূমি বা মানবিকতাবাদের প্রশ্ন। সংস্কৃতি চিন্তায় তাঁর যে মানসিকতা, তাতে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতাকে বারবার মেলাতে চেয়েছেন। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে সজাগ ও সজীব মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় প্রবন্ধগুলিতে যেন তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উপরের আলোচনা থেকে এতটুকু পরিষ্কার বলা যায়, তিনি মানুষের আজীবন কল্যাণ কামনা করেছেন। সেটা বারবার ধরা পড়েছে তাঁর মননভূমির ফসল প্রবন্ধগুলিতে। কখনো রাজনীতি, কখনো শিক্ষা, কখনো ধর্ম, কখনো বা সমাজভাবনা কখনো বা লোকসংস্কৃতি প্রাবন্ধিকের সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধগুলিতে মিলে মিশে রয়েছে অদৃশ্যভাবে। সেটা অবশ্য বুঝে নিতে সংস্কৃতিমনস্ক মন নিয়ে। মানবতার ভবিষ্যৎ, মানুষের মহৎ মূল্যবোধের পরম উপলব্ধি থেকেই এই ধরনের প্রবন্ধের সৃষ্টি। তিনি মানবিকবাদী, অন্ধকার দুর্যোগের মাঝে আলোরবর্তিকা। তবে তাঁর চিন্তা শুধু মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা দুর্বলতম ও দূরতম মানুষটির এবং পৃথিবীর ক্ষীণতম প্রাণটিরও প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। তাঁর মননভূমিতে যোগ হয়েছে গান্ধীজীর আধ্যাত্মিকতা, অহিংসা, করুণা, নৈতিকতাও বিবেকের আদর্শ। বিশ্বের সমগ্র মানব সমাজে তার মানবিকতা সম্প্রসারিত— *সেতু বন্ধন* তারই প্রমাণ দেয়। মানব সমাজের মৈত্রী ও শান্তি সম্প্রীতির ব্রতে তাঁর মানবিকতা সমৃদ্ধ। সকলের সঙ্গে সকলের মৈত্রী ও সম্প্রীতি। বর্ণ ও বর্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায় বিচার ও সকলের জন্য সমান ব্যক্তিমূল্যে বিশ্বাসী প্রাবন্ধিক। তিনি জানেন সংস্কৃতি থেকেই জন্মনেয়, আত্মীয়তার। কীভাবে সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে মেলবন্ধন হচ্ছে তারই উত্তর সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি।

তথ্যসূত্র:

১. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৬১

২. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৫, পৃ. ৩৬

৩. ঐ - পৃ. ৩৭

৪. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৫, পৃ. ৪৩

৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৫, পৃ. ৩৭১

৬. ঐ - পৃ. ৪১৭

৭. ঐ - পৃ. ৪১৮

৮. ঐ - পৃ. ৪১৮

৯. ঐ - পৃ. ৪১৯

১০. ঐ - পৃ. ৪২০

১১. ঐ - পৃ. ৪১৩

১২. ঐ - পৃ. ৩৯৭

১৩. ঐ - পৃ. ৩৯১-৩৯২

১৪. ঐ - পৃ. ৩৮৪

১৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৫, পৃ. ২৯০

১৬. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৪০১,

দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৯, পৃ. ৪২

১৭. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ২১৮

১৮. ঐ - পৃ. ২১৯

১৯. ঐ - পৃ. ২১৯

২০. ঐ - পৃ. ২২১

২১. ঐ - পৃ. ২২১

২২. ঐ - পৃ. ২২২

২৩. ঐ - পৃ. ২২৪

২৪. ঐ - পৃ. ২২৪

২৫. ঐ - পৃ. ২৩২

২৬. ঐ - পৃ. ২৩৪

২৭. ঐ - পৃ. ২৩৫

২৮. ঐ - পৃ. ২৩৬

২৯. ঐ - পৃ. ২৩৬

৩০. ঐ - পৃ. ২৩৮

৩১. ঐ - পৃ. ২৩৯

৩২. ঐ - পৃ. ২৪০

৩৩. ঐ - পৃ. ২৪০

৩৪. ঐ - পৃ. ২৪১

৩৫. ঐ - পৃ. ২৪২

৩৬. ঐ - পৃ. ২৪৫

৩৭. ঐ - পৃ. ২৪৮

৩৮. ঐ - পৃ. ২৪৯

৩৯. ঐ - পৃ. ২৪৯

৪০. ঐ - পৃ. ২৪৯

৪১. ঐ - পৃ. ২৫০

৪২. ঐ - পৃ. ২৫০

৪৩. ঐ - পৃ. ২৫০

৪৪. ঐ - পৃ. ২৫০

৪৫. ঐ - পৃ. ২৫১

৪৬. ঐ - পৃ. ২৫১

৪৭. ঐ - পৃ. ২৫৩

৪৮. ঐ - পৃ. ২৫৩

৪৯. ঐ - পৃ. ২৫৬

৫০. ঐ - পৃ. ২৭০

৫১. ঐ - পৃ. ২৭৩

৫২. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪০৯, পৃ. ১৪৭

৫৩. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৪৪

৫৪. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৪০৯, পৃ. ২১৬

৫৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬ পৃ. ২০

৫৬. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ৩৩০

৫৭. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ২০১

৫৮. ঐ - পৃ. ২০২

৫৯. ঐ - পৃ. ২০৩

৬০. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৩৭

৬১. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৫, পৃ. ১৪৪

৬২. ঐ - পৃ. ১৩৬

৬৩. ঐ - পৃ. ১৩৬

৬৪. ঐ - পৃ. ১৩৮

৬৫. ঐ - পৃ. ১৪৪

৬৬. ঐ - পৃ. ১৪৭

৬৭. ঐ - পৃ. ১৪৮-১৪৯

৬৮. ঐ - পৃ. ১৫১

৬৯. ঐ - পৃ. ১৫২

৭০. ঐ - পৃ. ১৫৫

৭১. ঐ - পৃ. ১৫৬

৭২. ঐ - পৃ. ১৬৯

৭৩. ঐ - পৃ. ১৭০

৭৪. ঐ - পৃ. ১৭৪

৭৫. ঐ - পৃ. ১৭৫

৭৬. ঐ - পৃ. ১৭৬

৭৭. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩১২

৭৮. ঐ - পৃ. ৩১৩

৭৯. ঐ - পৃ. ৩১৬

৮০. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৪১৬

৮১. ঐ - পৃ. ৪১৬

৮২. ঐ - পৃ. ৪১৭-৪১৮

৮৩. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক১৩৯৯, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৩